সূফীবাদ কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে

মুহাম্মদ ইবন জামীল যাইনূ

সূফীবাদ: এ গ্রন্থে সূফীবাদের হাকীকত, তাদের কতিপয় বাণী, ওলী কাকে বলে, কাসীদায়ে বুরদা কী, দালাইলুল খাইরাত গ্রন্থের পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

https://islamhouse.com/৩১৪৩৫৬

- সূফীবাদ কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে

- বাণী
- অনুবাদকের আরয
- সূফীবাদের তত্ত্বকথা
- সূফীবাদের কতিপয় বাণী
- সূফীদের করামতসমূহ
- সূফীবাদের নিকট জিহাদ
- সূফীদের নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য
- আর-রহমান-এর আউলিয়া
- শয়তানের আউলিয়া
- ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা
- ক্বাসীদাতুল বুরদা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?
- ‘দালাইলুল খাইরাত’ কিতাব সম্পর্কে কি জানেন?

সূফীবাদ কুরআন ও সুন্নাহ-এর মানদণ্ডে

[Bengali – বাংলা – بنغالي]

মুহাম্মাদ জামীল যাইনূ

অনুবাদ: মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন

বাংলাদেশের খ্যাতিমান সালাফী আলিম, সহীহ আল-বুখারী’র ব্যাখ্যাসহ সফল অনুবাদক শাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ সাহেব প্রদত্ত

বাণী

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى وآله وصحبه وسلم أجمعين وبعد:

(الصوفية في ميزان الكتاب والسنة) কিতাব খানা আমি একান্ত মনোযোগের সাথে আদ্যোপান্ত পাঠ করে দেখেছি। কিতাবটি সংকলন করেছেন মক্কায়ে মো‘আয্যমার দারুল হাদীস বিদ্যাপীঠের মহামান্য অধ্যাপক বহুগ্রন্থের প্রণেতা শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু। মাননীয় লেখক উক্ত কিতাবে সূফীবাদী তথাকথিত অলী-আউলিয়াদের অন্তর্নিহিত তথ্যাদি পরিস্কারভাবে পাঠকবর্গের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। উম্মতের সালফে সালেহীনের গৃহীত পথ অনুযায়ী কিতাব

ও সুন্নাহের আলোকে লেখক সূফীবাদের শির্ক ও বিদ‘আতমূলক ইসলাম বিরোধী ভ্রান্ত ও শূন্যগর্ভ ‘আকীদাগুলোর বিশদ ব্যাখ্যা করেছেন। বাংলার তথাকথিত পীরভক্ত অলী-আউলিয়া প্রভাবিত ধর্মভীরু বিভ্রান্ত মুসলিম জনতার পথনির্দেশরূপে কিতাবটির গুরুত্ব অত্যাধিক বলে আমরা একান্তভাবে বিশ্বাস করি। কিতাবটির বঙ্গানুবাদ এবং বহুল প্রচার ও প্রকাশ আমাদের একান্তই কাম্য।

সম্প্রতি আমাদের স্নেহভাজন তরুন ও উদীয়মান লেখক শাইখ মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন বাংলা ভাষায় কিতাবটি

অনুবাদ করেছেন। অনুদিত এই পুস্তকের নামকরণ করেছেন “কুরআন ও সুন্নাহের মানদণ্ডে সূফীবাদ”। নিঃসন্দেহে অনুবাদ একটি প্রশংসনীয় কাজ কাজ করেছেন। শাইখ মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন কর্তৃক অনুদিত “কুরআন ও সুন্নাহের মানদণ্ডে সূফীবাদ” গ্রন্থটির প্রকাশনার প্রতি আমরা চিন্তাশীল বদান্য ও সংস্কারপ্রিয় ব্যক্তিবর্গের নেক দৃষ্টি আকর্ষণ করছি এবং গ্রন্থটির বহুল প্রচার অন্তর দিয়ে কামনা করছি।

وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ

১৬/০১/২০০৩

অনুবাদকের আরয

الحمد لله حمدا الشاكرين الذاكرين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين وبعد.......

আল্লাহ প্রদত্ত অভ্রান্ত সত্য খুব পরিস্কার। সে কারণে ইসলামী আকীদাহ বিশ্বাস ও সংস্কৃতিতে ভেজাল মিশ্রণের প্রচেষ্টা হকপন্থী বিদ্বানদের নিকট আর অস্পষ্ট থাকে না। তারা কুরআন ও সুন্নাহের আলোকে 'হক' বর্ণনা করতঃ যে কোনো ভেজাল ও দূরভিসন্ধি

সম্পর্কে মুসলিম উম্মাহকে সতর্ক ও সাবধান করে দেন। মক্কার দারুল হাদীস-এর সুযোগ্য শিক্ষক শাইখ মুহাম্মাদ জামীল যাইনু প্রণীত “কুরআন ও সুন্নাহের মানদণ্ডে সূফীবাদ” নামক বইটি অনুরূপ এক অমূল্য অবদান। এটি মাননীয় লেখকের ‘হক’ ও বাতিলের পার্থক্য নির্দেশক সংক্ষিপ্ত অথচ নিরীক্ষণমূলক প্রামাণ্য বই।

মূল আরবী বইটি পাঠ করে বাংলা ভাষায় এর অনুবাদ খুবই জরুরি মনে করি। কেননা নামে বেনামে উক্ত সূফীবাদ বাংলাদেশের মুসলিমদের আকীদা-বিশ্বাসে সুক্ষ্ম অনুপ্রবেশ করে আছে।

আর অনেকেই এ ধরনের অমূলক ধর্মীয় বিশ্বাসকে ‘হক’ ও নির্ভুল ইসলাম মনে করে সযত্ন লালন করে চলছেন। এমনকি এর বিপরীতে ‘হক’ তুলে ধরাকে বিভ্রান্ত ও ফিতনা বলে আখ্যা দিতেও কুন্ঠিত হচ্ছেন না। কাজেই বাংলাদেশের মুসলিম ভাই ও বোনদের কাছে বিষয়টি তুলে ধরা অতি প্রয়োজন মনে করে অনুবাদে হাত দেই। আল্লাহর ফযল ও করমে আজ বইটি “কুরআন ও সুন্নাহের মানদণ্ডে সূফীবাদ” নামে পাঠকদের খিদমতে পেশ করতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত।

বইটি অনুবাদ শেষ করে তা পর্যালোচনার জন্য বন্ধুবর শাইখ

আবদুল বারী আব্বাস ও শাইখ মতীউর রাসূল সা‘য়দীকে আহ্বান জানাই। তাদেরকে নিয়ে অনবাদ পাণ্ডুলিপি মূল আরবী বই-এর সাথে মিলিয়ে নিরীক্ষা করা হয়। অতঃপর বাংলাদেশের খ্যাতিমান সালাফী আলিম সহীহ বুখারীর অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকার শাইখুল হাদীস অধ্যক্ষ মুহাম্মাদ আবদুস সামাদ সাহেবের খিদমতে বইটি পুণঃপর্যালোচনা করার ও একটি মূখবন্ধ লিখে দেওয়ার জন্য সবিনয় পেশ করি। তিনি অনুবাদ পাণ্ডুলিপি পাঠ করে একখানা বাণী লিখে দিয়ে বইটির শোভা বর্ধন করেন। অবশেষে বইটি প্রকাশ করার জন্য তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন ফাইন্ডেশন দ্রুত উদ্যোগ

গ্রহণ করায় আমি তাদেরকেও ধন্যবাদ জানাই। বইটি অনুবাদ ও প্রকাশনায় যারা যেভাবে সহযোগিতা করেছেন, আল্লাহ তাদেরকে উত্তম জাযা দান করুন। আমীন।

বইটি অনুবাদের সময় লেখকের মূলভাব তুলে ধরতে খুব চেষ্টা করা হয়েছে। এতদসত্বেও আমাদের সীমাবদ্ধতা বিদিত। তাই ভুল-ভ্রান্তি থাকাটা স্বাভাবিক। নেকীর কাজে সহযোগিতা মনে করে কোনো উদার পাঠক ভুল-ভ্রান্তি ধরে দিলে দীন অনুবাদক খুব খুশী হব। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্ভেজাল দীনের খিদমত করার তাওফীক দিন। আমীন!!

দো‘আ প্রার্থী

অনুবাদক

মুহাম্মাদ হারূন হোসাইন

তায়েফ ইসলামিক এ্যাডুকেশন
ফাইন্ডেশন

তায়েফ, সাউদী আরব, ০৫/১০/২০০২ইং

حقيقة الصوفية

সূফীবাদের তত্ত্বকথা

সূফীবাদ ইসলামী বিশ্বে প্রসার লাভ করেছে। আর মানুষেরা এর সাহায্যকারী কিংবা প্রতিরোধকারী দু’দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। কাজেই মুসলিম কীভাবে ‘হক’ চিনবে? সে কি সূফীদের

সাহয্যকারী দলের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং তাদের সাথেই চলবে? নাকি সে সূফীদের প্রতিরোধকারীদের একজন হবে এবং তাদেরকে বর্জন করে চলবে? (এই দ্বন্দ্ব নিরসনে) অবশ্যই কিতাব ও সহীহ সুন্নাহের দিকে ফিরে যেতে হবে, যাতে তদ্বিষয়ে সঠিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿فَإِن تَنَٰزَعۡتُمۡ فِي شَيۡءٖ فَرُدُّوهُ إِلَى ٱللَّهِ وَٱلرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩]

“অতঃপর যদি তোমরা কোনো বিষয়ে দ্বন্দ্বে পতিত হও, তাহলে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তন কর।” [সূরা আন-নিসা, আয়াত: ৫৯]

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর সাহাবী, তাবেঈ ও তাবে-তাবেঈদের যুগে ইসলাম সূফীবাদের নামও জানত না। অতঃপর একদল সাধক শ্রেণির আবির্ভাব ঘটল। আর তারা পশমী[১] কাপড় পরিধান করল। তখন থেকে তাদের উপর এই নাম প্রসার লাভ করল।

কেউ কেউ বলেন, সূফী কথাটি (الصوفيا) ‘সূফিয়া’ শব্দ থেকে গৃহীত। যার অর্থ: হিকমত বা কৌশল। যখন ইউনানী (গ্রীক) দর্শন শাস্ত্রাবলীর অনুবাদ হয় (তখন থেকেই এই শব্দের প্রয়োগ হয়)। সূফীদের কেউ কেউ এও ধারণা করে থাকতেন যে, তা ‘সাফা’ (الصفاء)

শব্দ থেকে চয়নকৃত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়। কেননা (الصفاء) শব্দটির প্রতি সম্বন্ধ করলে (صفائى) ‘সফাঈ’ হয়, সূফী হয় না। যেমন আবুল হাসান নদভী স্বীয় কিতাব (لا ربانية رهبانية)-এ বলেন, আহা তারা যদি সূফী না বলে ‘তাযকিয়া’ বা “আত্মশুদ্ধি” কথাটি বলত, যেমনটি আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَيُعَلِّمُهُمُ ٱلۡكِتَٰبَ وَٱلۡحِكۡمَةَ وَيُزَكِّيهِمۡ﴾ [البقرة: ١٢٩]

“আর তিনি তাদেরকে কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দিবেন এবং পবিত্র করবেন (আত্মার পরিশুদ্ধি ঘটাবেন)।” [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১২৯]

কাজেই এই নতুন নামের প্রকাশ মুসলিমদের মাঝে একটি ফিরকা (ফিতনা) মাত্র। তাছাড়া প্রথম যুগের সূফীদের থেকে শেষ যুগের সূফীরা অনেকাংশেই ভিন্ন। তাদের মাঝে এমন অনেক বিদ‘আতের প্রচলন ঘটেছে, যা এর পূর্বে ছিল না। তা থেকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

“তোমরা নবাবিষ্কৃত বিষয়াবলী থেকে সাবধান! কেননা সকল নবাবিষ্কৃত

বিষয়ই বিদ‘আত। আর সকল বিদ‘আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।”[২]

ন্যায়-বিচার এই যে, আমরা সূফীবাদের শিক্ষাকে ইসলামের মানদণ্ডে ফেলব, যেন দেখতে পাই- তা ইসলামের কতখানি নিকটে অথবা কতখানি দূরে :

১- সূফীবাদের একাধিক ত্বরীকা রয়েছে। যেমন, তিজানিয়্যাহ, কাদেরীয়্যাহ, নাক্শবান্দীয়্যাহ, শাযলীয়্যাহ, রিফা‘ঈয়্যাহ ইত্যাদি। অনেক পথ, যাদের প্রত্যেকটি ‘হক’-এর ওপর আছে বলে দাবী করে এবং অন্যটিকে বাতিল জানে। অথচ ইসলাম দলবিভক্তি থেকে নিষেধ করে। এ মর্মে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَكُونُواْ مِنَ ٱلۡمُشۡرِكِينَ ٣١ مِنَ ٱلَّذِينَ فَرَّقُواْ دِينَهُمۡ وَكَانُواْ شِيَعٗاۖ كُلُّ حِزۡبِۢ بِمَا لَدَيۡهِمۡ فَرِحُونَ ٣٢﴾ [الروم: ٣١، ٣٢]

“আর তোমরা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা তাদের ধর্মে বিভেদ সৃষ্টি করেছে এবং অনেক দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে আনন্দিত।” [সূরা আর-রূম, আয়াত: ৩১-৩২]

২- সূফীরা আল্লাহ ছাড়া নবী, ওলী ও জীবিত, মৃতদেরকে আহ্বান করে থাকে। তারা বলে, হে জীলানী! হে রিফা‘ঈ! হে ফরিয়াদ শ্রবণকারী আল্লাহর রাসূল! আপনি সাহায্য করুন। হে আল্লাহর রাসূল! আমি আপনার ওপর ভরসাকারী।

অথচ আল্লাহ অন্যকে আহ্বান করতে (অন্যের কাছে দো‘আ করতে) নিষেধ করেছেন। বরং একে শির্ক হিসেবে গণ্য করে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

“আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার ভালো করবে না এবং মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমনটি কর, তাহলে তুমিও (তখন) যালিমদের[৩] অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الدعاء هو العبادة».

“দো‘আই ইবাদত।” (তিরমিযী, তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

অতএব, সালাত যেমন ইবাদত দো‘আও অনুরূপ একটি ইবাদত। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকা জায়েয নয়, যদিও রাসূল বা ওলী হোন। আর তা শির্কে আকবর (বড় শির্ক)-এর একটি, যা আমল বাতিল করে দেয় এবং তাকে (মুশরিককে) চির জাহান্নামী করে।

৩- সূফীরা এই বিশ্বাস করে যে, তথায় আবদাল, কুতুব ও ওলী আউলিয়া রয়েছেন, যাদের প্রতি আল্লাহ তা‘আলা বিবিধ কর্ম পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। অথচ

পূর্বকালের মুশরিকরাও এ ধরনের জঘন্য শির্ক করতো না। জিজ্ঞাসাকালে প্রদত্ত আরবের মুশরিকদের জবাবের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُۚ﴾ [يونس: ٣١]

“আর কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন? তখন তারা জবাবে বলবে, আল্লাহ।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩]

আর সূফীরা বিপদ-মুসীবত আপতিত হলে আল্লাহ ছাড়া অন্যের আশ্রয় চেয়ে থাকেন। অথচ আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧﴾ [الانعام: ١٧]

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট (ক্ষতি) দেন, তাহলে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে তিনি যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সকল কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৭]

জাহেলী যুগে মুশরিকদের ওপর আপতিত বিপদ-মুসীবতের সময় তাদের কর্মকাণ্ডের বিবরণ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

﴿ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ ٱلضُّرُّ فَإِلَيۡهِ تَجۡـَٔرُونَ﴾ [النحل: ٥٣]

“অতঃপর যখন তোমরা দুখ-কষ্টে পতিত হও, তখন তাঁরই নিকট

কান্নাকাটি কর।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ৫৩]

৪- সূফীদের এক শ্রেণী অদ্বৈতবাদে বিশ্বাসী। তাদের নিকট স্রষ্টা ও সৃষ্টি (খালেক ও মাখলুক) বলতে কিছু নেই। সবই সৃষ্টি সবই ‘ইলাহ’। এদের পুরোধা হচ্ছে সিরিয়ার দামেস্ক-এ সমাহিত ‘ইবন আরাবী’। সে বলে:

العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من المكلف؟

إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فأنَّى رب يكلف؟

“বান্দাই রব, আর রবই বান্দা, আহা যদি জানতাম কে মুকাল্লাফ (শরী‘আতের নির্দেশ মানতে বাধ্য)?

যদি বলি বান্দা, তাহলে তা-ই সত্য। অথবা যদি বলি রব, তবে কোথায় সে রব যে মুকাল্লাফ (আদেশ পালনের জন্য বলা) হবে?”[৪]

৫- সূফীবাদ দুনিয়ার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন ও আল্লাহর পথে জিহাদ ছেড়ে দিতে ও বৈরাগ্যতার পথে বেছে নিতে আহ্বান জানায়। অথচ মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

﴿وَٱبۡتَغِ فِيمَآ ءَاتَىٰكَ ٱللَّهُ ٱلدَّارَ ٱلۡأٓخِرَةَۖ وَلَا تَنسَ نَصِيبَكَ مِنَ ٱلدُّنۡيَا﴾ [القصص: ٧٧]

“আল্লাহ তোমাকে যা দান করেছেন, তা দ্বারা পরকালের গৃহ অবলম্বন অনুসন্ধান কর এবং ইহকাল থেকে

তোমার অংশ ভুলে যেয়ো না।” [সূরা আল-কাসাস, আয়াত: ৭৭]

(আল্লাহ আরো বলেন,)

﴿وَأَعِدُّواْ لَهُم مَّا ٱسۡتَطَعۡتُم مِّن قُوَّةٖ﴾ [الانفال: ٦٠]

“তোমাদের সাধ্যানুযায়ী শক্তি-সামর্থ্য নিয়ে তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কর।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৬০]

৬- সূফীরা তাদের পীরদের (ধর্মগুরু) কে ‘ইহসানের’ মঞ্জিল দিয়ে থাকে এবং আল্লাহর যিকিরকালে তাদের পীর ও মুরব্বীদের ছবি কল্পনায় নিয়ে আসার জন্য (অনুসারী) সূফীদের প্রতি আহ্বান জানায়। এমনকি সালাত আদায়ের

সময়েও (তারা তাদের পীরদেরকে সামনে কল্পনা করে। তাদের মনোরঞ্জনের উদ্দেশ্যে সালাত আদায় করে।) আমার নিকটে এক লোক ছিল, তাকে তার পীরের ছবি সালাতের সামনে রাখতে দেখেছি। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ»

“ইহসান হচ্ছে- আল্লাহর ইবাদত এমনভাবে করবে, যেন তুমি তাঁকে দেখছ। আর যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তাহলে (এই বিশ্বাস ষোল আনা রাখবে যে) তিনি তোমাকে অবশ্যই দেখছেন।”[৫]

৭- সূফীবাদ এই দাবী করে থাকে যে, আল্লাহর ইবাদত তাঁর জাহান্নামের শাস্তির ভয়ে কিংবা জান্নাতের লোভে করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে তারা রাবে‘আহ আল-আদভীয়্যাহ-এর নিম্নোক্ত কথামালা দ্বারা দলীল হিসেবে সাক্ষ্য গ্রহণ করে:

اللهم إن كنت أعبدك خوفا من نارك فأحرقني فيها وإن كنت أعبد طمعا في جنتك فاحرمني منها.

“হে আল্লাহ! যদি তোমার জাহান্নামের আগুনের ভয়ে তোমার ইবাদত করে থাকি, তাহলে তুমি তাতে আমাকে পুড়িয়ে মার। আর যদি তোমার জান্নাতের আশায় তোমার ইবাদত করে থাকি,

তাহলে আমাকে তুমি তা থেকে বঞ্চিত কর।”

আপনি শুনে থাকবেন যে, তারা আবদুল গনী আল-নাবলুসী-এর নিম্নোক্ত বাক্য দ্বারা কবিতা আবৃতি করে:

من كان يعبد الله خوفا من ناره فقد عبد النار ومن
عبد الله طلبا للجنة فقد عبد الوثن.

“যে বক্তি আল্লাহর ইবাদত করে তাঁর অগ্নির (জাহান্নামের) ভয়ে সে যেন আগুনেরই ইবাদত করল। আর যে ব্যক্তি জান্নাতের প্রার্থনায় আল্লাহর ইবাদত করল, সে যেন মূর্তির ইবাদত করল।”

অথচ মহান আল্লাহ নবীদের প্রশংসা করেন, যারা তাঁকে ডাকত তাঁর জান্নাত কামনা করে ও তাঁর আযাবকে ভয় করে। তিনি বলেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ﴾ [الانبياء: ٩٠]

“তারা সৎ কর্মে ঝাপিয়ে পড়ত। তারা আশা ভীতি[৬] সহকারে আমাকে ডাকত।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূলে কারীমকে সম্বোধন করে বলেন,

﴿قُلۡ إِنِّيٓ أَخَافُ إِنۡ عَصَيۡتُ رَبِّي عَذَابَ يَوۡمٍ عَظِيمٖ ١٥﴾ [الانعام: ١٥]

“আপনি বলুন! আমি আমার রবকে অবাধ্য হতে ভয় পাই। কেননা আমি একটি মহা দিবসের শাস্তিকে ভয় করি।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫]

৮- অনেক সূফীবাদীরা ঢোল-বাদ্য বাজনা ও উচ্চস্বরে আল্লাহর যিকির করাকে বৈধ মনে করেন। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّمَا ٱلۡمُؤۡمِنُونَ ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ ٱللَّهُ وَجِلَتۡ قُلُوبُهُمۡ﴾ [الانفال:٢]

“মুমিন তো তারাই, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয়, তখন তাদের অন্তর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ২]

তাছাড়া আপনি আরও দেখবেন, তারা ‘আল্লাহ’ শব্দের যিকির করে। এমনকি শেষে পর্যন্ত (আল্লাহ শব্দ ছেড়ে দিয়ে) আহ, আহ শব্দে পৌঁছে যায়। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«أفضل الذكر لا إله إلا الله»

“সর্বোত্তম যিকির হচ্ছে, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত কোনো (হক) ইলাহ নেই- এই পুরো কালেমা। আর যিকির ও দো‘আর বেলায় তা উচ্চস্বরে করা আল্লাহর বাণী দ্বারা নিষিদ্ধ। অর্থাৎ চেচামেচি করে দো‘আ করা নিষিদ্ধ। আল্লাহ বলেন,

﴿ٱدۡعُواْ رَبَّكُمۡ تَضَرُّعٗا وَخُفۡيَةًۚ﴾ [الاعراف: ٥٥]

“তোমরা স্বীয় রবকে ডাক, কাকুতি-মিনতি করে এবং সংগোপনে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৫]

সাহাবায়ে কেরাম রাদিয়াল্লাহু আনহুম উচ্চস্বরে আল্লাহকে ডাকতেন। তা শুনতে পেয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের উদ্দেশ্যে বলেন,

«أَيُّهَا النَّاسُ ارْبَعُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ، إِنَّكُمْ لَيْسَ تَدْعُونَ أَصَمَّ وَلَا غَائِبًا، إِنَّكُمْ تَدْعُونَ سَمِيعًا قَرِيبًا، وَهُوَ مَعَكُمْ»

“হে মানবমণ্ডলী! তোমরা নিজেদের উপর দয়াবান হও। তোমরা কোনো বধির ও গায়েব সত্তাকে ডাকছ না; বরং

তোমরা তো অতি শ্রবণকারী-নিকটে থাকা সত্তাকে ডাকছ- যিনি তোমাদের সাথে আছেন। অর্থাৎ তিনি তাঁর শ্রবণশক্তি ও জ্ঞান নিয়ে তোমাদের সাথে আছেন।”[৭]

৯- সূফীরা মদ ও নেশাযুক্ত দ্রব্যের নাম নিয়ে থাকে। ইবনুল ফারিদ্ব নামীয় জনৈক সূফী কবি বলেন,

شربنا على ذكر الحبيب مدامة

سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم

“প্রিয়তমের স্মরণে আমরা মুদামা নামীয় সরাব পান করলাম আর সম্মানিত সত্তার সৃষ্টির পূর্বে তদ্বারা আমরা নেশাযুক্ত হলাম।”

আমি তাদেরকে মসজিদে কবিতা আবৃত্তি করতে শুনেছি-

هات كأس الراح واسقنا الأقداح

“রাহ্ নামক মদের গ্লাস দাও, আর আমাদেরকে পেয়ালা পেয়ালা ভরে পান করাও!”

আমি বলি, যে আল্লাহর ঘর আল্লাহর যিকির-এর জন্য নির্মাণ করা হয়েছে, সেখানে হারাম মদ-এর নাম নিতে সূফীরা লজ্জা করে না? অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِنَّمَا ٱلۡخَمۡرُ وَٱلۡمَيۡسِرُ وَٱلۡأَنصَابُ وَٱلۡأَزۡلَٰمُ رِجۡسٞ مِّنۡ عَمَلِ ٱلشَّيۡطَٰنِ فَٱجۡتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمۡ تُفۡلِحُونَ ٩٠﴾ [المائدة: ٩٠]

“হে মুমিনগণ! এই যে মদ, জুয়া, প্রতিমা এবং ভাগ্য নির্ধারক শরসমূহ- এসব শয়তানের অপবিত্র কার্য বৈ তো নয়। অতএব, এগুলো থেকে বেঁচে থাকো- যাতে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হও।” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৯০]

১০- সূফীরা যিকির-এর মজলিসে নারী ও বালকদের আসক্তি, প্রবৃত্তি এবং লাইলা- সু‘আদ এতদ্ভিন্ন প্রেমিকার নাম জপ্ করতে থাকে। মনে হয় তারা যেন গানের আসরে আছে। যেখানে আছে বাজনা, মদের আলোচনা, হাততালি ও চেচামেচি। আর তা সুবিদিত যে, ‘হাত তালিতো মুশরিকদের ইবাদত ও তাদের

অভ্যাসের অন্তর্গত। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمۡ عِندَ ٱلۡبَيۡتِ إِلَّا مُكَآءٗ وَتَصۡدِيَةٗۚ﴾ [الانفال: ٣٥]

“আর কা‘বার নিকট তাদের সালাত বলতে শিস দেওয়া আর তালি বাজানো ছাড়া অন্য কোনো কিছুই ছিল না।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৫]

১১- সূফীরা যিকির-এর সময় বিভিন্ন ধরনের বাজনা ব্যবহার করে, যা শয়তানের গীত। একদা আবু বকর রাদিয়াল্লাহু আনহু তার কন্যা আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহার গৃহে প্রবেশ করে দেখতে পেলেন তার নিকট দু’টি বালিকা দফ বাজাচ্ছে। তখন আবু বকর

রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, শয়তানের গীত, শয়তানের গীত। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে লক্ষ্য করে বললেন: হে আবু বকর! এদেরকে ছেড়ে দাও। কেননা তারা তো ঈদের দিনে আছে।”

আবু বকর-এর কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সায় দিলেন বটে; কিন্তু তাকে এই মর্মে সংবাদ দিলেন যে, বালিকাদের জন্য ঈদের দিনে এর অবকাশ রয়েছে। তবে সাহাবী ও তাবেঈন থেকে দফ ব্যবহারের কোনো প্রমাণ মেলে না; বরং তা সূফীদের সেই বিদ‘আতী কার্যক্রমের অন্তর্গত, যা থেকে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

«مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»

“কেউ এমন কোনো কাজ করল, যাতে আমাদের কোনো নির্দেশ নেই তা প্রত্যাখ্যাত।”[৮]

১২- কোনো কোনো সূফীরা লোহার খণ্ডাংশ দ্বারা নিজেদের দেহে প্রহার করে আর বলে: হে অমুক! অতঃপর শয়তানরা তার কাছে সহযোগিতার জন্য আসে। কেননা সেতো গাইরুল্লাহ নামে সাহায্য প্রার্থনা করেছে। এ সব সাহায্যকারী যে শয়তান এতে কোনো

সন্দেহ নেই। এর প্রমাণ আল্লাহর বাণী:

﴿وَمَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦﴾ [الزخرف: ٣٦]

“যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর যিকির থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দিই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

আর কোনো কোনো জাহিল ধারণা করে যে, এই কাজটি কারামত বা অলৌকিক কর্মের অন্তর্গত। হতে পারে এই কাজটির কর্তা একজন ফাসিক কিংবা সালাত পরিত্যাগকারী। তাই কী করে আমরা একে কারামত গণ্য

করব? আর এ জাতীয় সম্পাদনকারী ‘হে অমুক’ বলে গাইরুল্লাহ’র সাহায্য প্রার্থনা করল। এ কাজটি তো শির্ক ও গোমরাহীর কাজ, যার সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَنۡ أَضَلُّ مِمَّن يَدۡعُواْ مِن دُونِ ٱللَّهِ﴾ [الاحقاف: ٥]

“তার চেয়ে অধিক গোমরাহ কে (?) যে আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে আহ্বান করে….।” [সূরা আল-আহকাফ, আয়াত: ৫]

এটি গোমরাহীর পথের একটি ক্রমধারা। যখন ব্যক্তি স্বয়ং তার জন্য এই পথ অবলম্বন করে, তখন

আল্লাহ তা‘আলা তাকে তাতে থাকতে দেন। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدًّاۚ﴾ [مريم: ٧٥]

“(হে নবী আপনি) বলুন! তারা পথভ্রষ্টতায় আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দিবেন....।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫]

১৩- সূফীবাদের অনেক তরীকা আছে। যেমন, তিজানিয়া, শায্লিয়া, নাক্শবন্দীয়া ইত্যাদি। অথচ ইসলামের মাত্র একটি তরীকা। এর প্রমাণে ইবন মাসউদ রাদিয়াল্লাহু আনহুমা কর্তৃক বর্ণিত হাদীসখানা প্রনিধানযোগ্য। তিনি বলেন,

«خَطَّ لَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خطًّا، ثُمَّ قَالَ: "هَذَا سَبِيلُ اللهِ"، ثُمَّ خَطَّ خُطُوطًا عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ شِمَالِهِ، ثُمَّ قَالَ: "هَذِهِ سُبُلٌ - قَالَ يَزِيدُ: مُتَفَرِّقَةٌ - عَلَى كُلِّ سَبِيلٍ مِنْهَا شَيْطَانٌ يَدْعُو إِلَيْهِ "، ثُمَّ قَرَأَ: (وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ) [الأنعام:١٥٣]»

“রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের জন্য তাঁর হাত দ্বারা একটি সরল রেখা অংকন করলেন। অতঃপর বললেন, এটি আল্লাহর সোজা পথ। আর এর ডানে ও বামে আরও কয়েকটি রেখা টানলেন। এরপর বললেন: এ সমস্ত পথ, যার প্রতিটিতে শয়তান আছে এবং সেদিকে

ডাকছে। অতঃপর আল্লাহর নিম্নোক্ত বাণী তিলাওয়াত করলেন:

﴿وَأَنَّ هَٰذَا صِرَٰطِي مُسۡتَقِيمٗا فَٱتَّبِعُوهُۖ وَلَا تَتَّبِعُواْ ٱلسُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمۡ عَن سَبِيلِهِۦۚ ذَٰلِكُمۡ وَصَّىٰكُم بِهِۦ لَعَلَّكُمۡ تَتَّقُونَ ١٥٣﴾ [الأنعام: ١٥٣]

“আর নিশ্চয় এটি আমার সরল পথ। অতএব, এ পথে চল এবং অন্যান্য পথে চলো না। তাহলে সেসব পথ তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে এ নির্দেশ দিয়েছেন, যাতে তোমরা সংযত হও!” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৫৩][৯]

১৪- সূফীবাদ কাশফ বা অন্তর্দৃষ্টি ও অদৃশ্য বিদ্যার দাবী করে। অথচ কুরআন তাদের এই দাবী মিথ্যা

প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُل لَّا يَعۡلَمُ مَن فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلۡأَرۡضِ ٱلۡغَيۡبَ إِلَّا ٱللَّهُۚ﴾ [النمل: ٦٥]

“বলুন! আল্লাহ ব্যতীত আসমান ও জমীনের কেউ গায়েবের বিদ্যা জানে না।” [সূরা আন-নামল, আয়াত: ৬৫]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لا يعلم الغيب إلا الله»

“আল্লাহ ব্যতীত কেউ গায়েব জানে না।”[১০]

১৫- সূফীদের বিশ্বাস যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ তাঁর নূর থেকে সৃষ্টি করেছেন। আর মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নূর থেকে সকল কিছু সৃষ্টি করেছেন। অথচ আল-কুরআন তাদের এই দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করতঃ বর্ণনা করে:

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ﴾ [الكهف: ١١٠]

“(হে নবী আপনি) বলুন! আমি তো কেবল তোমাদের মতো একজন মানুষ, আমার কাছে অহী করা হয়।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আদম সৃষ্টি প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿إِذۡ قَالَ رَبُّكَ لِلۡمَلَٰٓئِكَةِ إِنِّي خَٰلِقُۢ بَشَرٗا مِّن طِينٖ ٧١﴾ [ص: ٧١]

“যখন আপনার রব ফিরিশতাগণকে বললেন, আমি মাটির মানুষ সৃষ্টি করব।” [সূরা সোয়াদ, আয়াত: ৭১]

আর (যে হাদীস দ্বারা ‘নবী নূরের তৈরি’ দাবীকারীগণ দলীল পেশ করে থাকেন, তা হচ্ছে:)

أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر

“হে জাবের! সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূর তৈরি করেছেন।” এটি বানোয়াট ও বাতিল হাদীস।

১৬- সূফীবাদ এই ধারণা করে যে, পৃথিবীকে আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর কুরআন তাদেরকে মিথ্যাবাদী বলে আখ্যা দিয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জিন্ন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আল-জারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

আর কুরআন তার ভাষায় রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বোধন করে বলে:

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩﴾ [الحجر: ٩٩]

“(হে মুহাম্মাদ!) আর আপনি আপনার রবের ইবাদত করুন, যতক্ষণ না আপনার কাছে নিশ্চিত বিষয় মৃত্যু আগমন করে।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৯]

১৭- সূফীবাদ দুনিয়াতে আল্লাহর দীদার বা দর্শন বিশ্বাস করে থাকে। অথচ কুরআন তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। মূসা ‘আলাইহিস সালাম-এর যবানীতে উল্লেখ করতঃ আল-কুরআনে বলা হয়েছে:

﴿رَبِّ أَرِنِيٓ أَنظُرۡ إِلَيۡكَۚ قَالَ لَن تَرَىٰنِي﴾ [الأعراف: ١٤٣]

“হে আমার রব! তোমার দীদার আমাকে দাও, যেন আমি তোমাকে দেখতে পাই, আল্লাহ বললেন: তুমি (দুনিয়াতে) কখনো আমাকে দেখতে পাবে না।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৪৩]

গাযালী স্বীয় ‘ইহ্ইয়াউ উলুমিদ দীন’ গ্রন্থে প্রেমিকদের ও তাদের অন্তর্দৃষ্টিসমূহের বিবরণ অনুচ্ছেদে এ ঘটনা উল্লেখ করেন যে, “আবু তুরাব (তার বন্ধুকে লক্ষ্য করে) একদিন বলেন, তুমি যদি আবু ইয়াযিদ আল-বুস্তামীকে (যিনি একজন সূফী সাধক ছিলেন তাকে) দেখতে! তখন তার বন্ধু তাকে বলল, আমি তা থেকে ব্যস্ত। অর্থাৎ তার আমার প্রয়োজন নেই।

আমি তো আল্লাহকে দেখেছি। কাজেই আল্লাহ আমাকে আবু ইয়াযিদ থেকে অমুখাপেক্ষী করে দিয়েছেন। আবু তুরাব বলল, তুমি ধ্বংস হও! তুমি তো আল্লাহকে নিয়ে ধোকায় পড়ে আছ! যদি তুমি একবার আবু ইয়াযিদ আল-বুস্তামীকে দেখতে, তাহলে আল্লাহকে সত্তর (৭০) বার দেখার চেয়ে তা তোমার জন্য অধিক উপকারী হত!” অতঃপর গাযালী বলেন, এ ধরনের কাশ্ফ বিষয়ক ঘটনা অস্বীকার করা কোনো মুমিন ব্যক্তির জন্য উচিত নয়।

আমি (লেখক) গাযালীকে বলব: বরং তা অস্বীকার করা মুমিনের ওপর ওয়াজিব।

কেননা তা মিথ্যা ও কুফর যা কুরআন, হাদীস ও সুস্থ্য বিবেক বিরোধী।

১৮- সূফীবাদ দুনিয়াতে জাগ্রত অবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দীদার বা দর্শনের দাবী ও ধারণা করে। অথচ কুরআন তাদের দাবী মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

﴿وَمِن وَرَآئِهِم بَرۡزَخٌ إِلَىٰ يَوۡمِ يُبۡعَثُونَ﴾ [المؤمنون: ١٠٠]

"আর তাদের সামনে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত পর্দা অর্থাৎ বরযখের যিন্দেগী রয়েছে।" [সূরা আল-মুমিনূন, আয়াত: ১০০]

অর্থাৎ তাদের সামনে পর্দা আছে। যা কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ার প্রত্যাবর্তন ও তাদের মাঝে অন্তরায় হবে।

আর (রাসূলের মৃত্যুর পর) কোনো সাহাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জাগ্রত অবস্থায় দেখেছেন- এই মর্মে আমাদের নিকট কোনো বর্ণনা আসে না। তাহলে কি সূফীরা সাহাবী থেকে উত্তম? পবিত্রয় হে আল্লাহ! এ তো বড় অপবাদ।

১৯- সূফীবাদ ধারণা করে যে, তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যম ছাড়া সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে ‘ইলম’ গ্রহণ

করে। তারা বলে: “আমার কলব রবের নিকট থেকে বর্ণনা করে।”

দামেস্কে সমাহিত ইবন আরাবী স্বীয় আল-ফুসুস গ্রন্থে বলেন, আমাদের মাঝে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোনো বিশেষ লোক আছেন, যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হিকমত শিক্ষা করেন অথবা ইজতিহাদের সাহায্যে অর্জন করেন, যা তিনি মূল বিদ্যা হিসেবেও স্থির করেন। অথচ আমাদের মাঝে এমন খলীফা আছেন, যিনি আল্লাহ থেকে সরাসরি গ্রহণ করেন। কাজেই তিনি হলেন, আল্লাহর খলীফা।”

আমি বলি: এই কথা বাতিল; কুরআনের বিপরীত। কুরআনের মূল বক্তব্য এই যে, আল্লাহ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে পাঠিয়েছেন- যাতে তিনি আল্লাহর আদেশাবলী মানুষের নিকট পৌঁছে দেন। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلرَّسُولُ بَلِّغۡ مَآ أُنزِلَ إِلَيۡكَ مِن رَّبِّكَ﴾ [المائدة: ٦٧]

“হে রাসূল! তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার প্রতি যা নাযিল করা হয়েছে তা পৌঁছে দাও!” [সূরা আল-মায়েদাহ, আয়াত: ৬৭]

আল্লাহর পক্ষ থেকে সরাসরি অর্জন করা কারোর পক্ষে সম্ভব নয়। সেটি

একটি মিথ্যা ও অহেতুক কথা। অতঃপর মানুষ নিঃসন্দেহে আল্লাহর খলীফা হতে পারে না। কেননা আল্লাহ আমাদের থেকে গায়েব নয় যে, মানুষ তাঁর খলীফা হবে। অপর দিকে আমরা যখন অনুপস্থিত থাকি ও সফর করি, তখন তিনিই আমাদের খলীফা হন। অর্থাৎ আমাদের পরিবর্তে তিনি আমাদের পরিবারের দেখাশুনা করেন। এই মর্মে হাদীস এসেছে:

«اللهم أنت الصاحب في السفر، والخليفة في الأهل».

“হে আল্লাহ! তুমিই (আমাদের) সফরের সাথী ও পরিবার পরিজনের খলীফা।”[১১]

২০- সূফীবাদ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওপর দুরূদ পাঠের অধিবেশনের নামে মীলাদ মাহফিল ও ইজতেমা অনুষ্ঠান করে। তারা তো নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিক্ষা বিরোধী কাজ করে। সে কারণে তারা যিকির, গযল ও কবিতা আবৃত্তির সময় উচ্চস্বরে ডাকতে আরম্ভ করে যার মাঝে প্রকাশ্য শির্ক রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করে তাদেরকে আমি বলতে শুনেছি:

المدد يا عريض الجاه المــدد ويا مفيض النور
على الوجود المدد

يا رسول الله فــرج كربنا مـــا رآك الكـــرب إلا وشرد

“সাহায্য চাই হে প্রশস্ত মর্যাদার অধিকারী সাহায্য চাই,

সকল কিছুতে নূরের বিতরণকারী ওহে সাহায্য চাই।

দূর করে দাও হে রাসূল! মোদের বিপদ।

তোমাকে দেখিবা মাত্রই পালায় বিপদ।”

আমি বলি: ইসলাম আমাদের প্রতি এ বিশ্বাস আবশ্যক করে দেয় যে, সকল কিছুতে আলো বিতরণকারী এবং বিপদগ্রস্তদের বিপদ দূরকারী একমাত্র মহান আল্লাহ।

২১- সূফীবাদ কবরবাসীদের নিকট বরকত চাওয়া অথবা কবরের চতুষ্পার্শ্বে তাওয়াফ করা অথবা কবরের কাছে যবেহ করার তীর্থ যাত্রা করে। তারা তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلَّا إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ: المَسْجِدِ الحَرَامِ، وَمَسْجِدِي هَذَا، وَمَسْجِدِ الأَقْصَى».

“তিনটি মসজিদ ছাড়া (পৃথিবীর কোথাও সাওয়াবের উদ্দেশ্যে) সফর বৈধ নয়। মসজিদ ৩টি হচ্ছে আল-মাসজিদুল হারাম (কা‘বা ঘর), আমার এই মসজিদ

(মসজিদে ননবী) ও আল-মাসজিদুল আক্বসা।”[১২]

২২- সূফীবাদ তার পীর-মাশাইখের অনুসরণ আবশ্যক করে নেওয়ার বেলায় অত্যন্ত কট্টরপন্থী। যদিও তাদের সেসব শিক্ষা আল্লাহ ও তার রাসূলের কথার বিরোধী হয়। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُقَدِّمُواْ بَيۡنَ يَدَيِ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ﴾ [الحجرات: ١]

“হে ঈমানদারগণ! তোমার আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সামনে অগ্রণী হয়ো না।” [সূরা আল-হুজুরাত, আয়াত:১]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ طَاعَةَ لأحد فِي مَعْصِيَةٍ، إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي المَعْرُوفِ»

“আল্লাহর অবাধ্যতায় কারো আনুগত্য নেই; আনুগত্য কেবল ভালো কাজে।”[১৩]

২৩- সূফীবাদ কোনো কাজে ইস্তেখারা বা কল্যাণ কামনার জন্য তাবিজের নকশা, বিভিন্ন বর্ণ ও সংখ্যা এবং তাবিজ তুমার ইত্যাদি ব্যবহার করে। আমি বলি: ইস্তেখারার ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রীর নামের সংখ্যার হিসাব করে কেন তারা কুসংস্কার, বিদ‘আত ও শরী‘আত বিগর্হিত বিষয়াদির প্রতি

ঝুঁকে যায়? আর সহীহ বুখারীতে বর্ণিত ইস্তেখারার দো‘আ ছেড়ে দেয়। অথচ এ দো‘আটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সাহাবীদেরকে কুরআনের সূরার ন্যায় শিক্ষা দিতেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বলেন, যখন তোমাদের কেউ কোনো কাজের পদক্ষেপ নেয়, তখন সে যেন দু’রাকাত নফল সালাত আদায় করে। অতঃপর বলে: (এই দো‘আ পাঠ করে)

«دعاء الاستخارة : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلاَ أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلاَ أَعْلَمُ، وَأَنْتَ عَلَّامُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي

عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاقْدُرْهُ لِي، وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي - أَوْ قَالَ: فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ - فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ، وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ، ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ»

“হে আল্লাহ আমি তোমার ইলম-এর মাধ্যমে তোমার নিকট কল্যাণ কামনা করছি। তোমার কুদরতের মাধ্যমে তোমার নিকট শক্তি কামনা করছি এবং তোমার মহান অনুগ্রহের প্রার্থনা করছি। কেননা তুমি শক্তিধর, আমি শক্তিহীন। তুমি জ্ঞানবান, আমি জ্ঞানহীন এবং তুমি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে পূর্ণজ্ঞানী। হে আল্লাহ! এই কাজটি (এখানে উদ্দিষ্ট কাজের নাম নেবে) তোমার ইলম অনুযায়ী যদি

আমার দীন, জীবিকা ও আমার কাজের পরিণতির দিক দিয়ে কল্যাণকর হয় তাহলে তা আমার জন্য নির্ধারিত করে দাও। অতঃপর তাতে আমার জন্য বরকত দাও। পক্ষান্তরে যদি এই কাজটি তোমার ইলম অনুযায়ী আমার দীন, জীবিকা ও কাজের পরিণতির দিক দিয়ে ক্ষতিকর হয় তাহলে তুমি তা আমার নিকট থেকে দূরে সরিয়ে দাও এবং আমাকে তা থেকে দূরে রাখো! আর যেখানেই কল্যাণ থাকুক না কেন, আমার জন্য সে কল্যাণ নির্ধারিত করে দাও! অতঃপর তাতেই আমাকে পরিতুষ্ট রাখো!”[১৪]

২৪- সূফীবাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণিত দুরূদসমূহের প্রতি ভ্রূক্ষেপ করে না, বরং এমন সব দুরূদ নতুন করে আবিষ্কার করে; যাতে প্রকাশ্য শির্ক রয়েছে এবং যা সেই নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুশী করবে না। যার প্রতি তারা তা পাঠ করে। লেবাননী সূফী পীরের রচিত ‘আফদালুস সালাওয়াত’ কিতাবে পড়েছি, যাতে তিনি বলেন,

اللهم صل على محمد حتى تجعل منه الأحدية القيومية

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করুন। এমনকি তাঁকে

একত্ব ও চিরস্থায়ীত্বের স্তরে উন্নীত করে দিন।” নাউযুবিল্লাহ।

আমি বলি: ‘একত্ব চিরস্থায়ীত্ব’ আল্লাহর গুণাবলী ও নামসমূহের অন্যতম। অনুরূপভাবে ‘দালাইলুল খাইরাত’ গ্রন্থে বিদ‘আতী দুরূদসমূহ রয়েছে, যা আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) রাজি হবেন না।

২৫- হে মুসলিম ভাই! সূফীদের আকীদাহ ও আমলসমূহ ইসলামের মানদণ্ডে যাচাই করে দেখেছি যে, সূফীবাদ ইসলাম থেকে বহু দূরে। আর নিঃসন্দেহে সুস্থ্য বিবেকে এই সমস্ত বিদ‘আত, ভ্রষ্টতা

ও শরী'আত বিগর্হিত কার্য্যাদি (যাতে শির্ক ও কুফুরী রয়েছে) বর্জন করবে।

সূফীবাদের কতিপয় বাণী

অনেক মানুষ আছে, যারা ধারণা করে যে, সূফীবাদ ইসলামেরই একটি শাখা। তাদের মাঝে অলী-আউলিয়া রয়েছেন। সে কারণে আমি চাই প্রত্যেক মুসলিম ভাই তাদের কথাগুলো পর্যবেক্ষণ করে দেখুন, যাতে অবশ্যই দেখতে পাবেন যে, তারা ইসলাম ও কুরআনী শিক্ষা থেকে বহু দূরে।

১- দামেস্কে সমাহিত একজন বড় সূফী পীর মহিউদ্দিন ইবন আরাবী তার 'ফুতুহাত আল-মাক্কিয়্যাহ' গ্রন্থে

বলেন, বর্ণনাসূত্রে কোনো হাদীস সহীহ হতে পারে। তবে কাশ্ফওয়ালা ব্যক্তি সচক্ষে দেখতে পান। অতঃপর তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই হাদীস সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন। তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা অস্বীকার করেন। আর তাকে লক্ষ্য করে বলেন, আমি এই হাদীস বলি নি এবং আমি কোনো আদেশ দেই নি। কাজেই তিনি জেনে নেন যে, হাদীসটি দ‘ঈফ। সে কারণে রবের স্পষ্ট নির্দেশনার আলোকে এই হাদীসের ওপর আমল পরিত্যাজ্য। যদিও বর্ণনা সূত্রের বিশুদ্ধতার কারণে

হাদীসবেত্তাগণ এটির ওপর আমল করে থাকেন। অথচ বিষয়টি অনুরূপ নয়।”

উপরোক্ত কথাগুলো ‘আল-আহাদীছ আল-মুশতাহারা লিল আজলূনী’ নামক কিতাবের ভূমিকায় রয়েছে। এটি জঘন্য কথা। নবীর হাদীসের ওপর আঘাত এবং ইমাম বুখারী ও মুসলিম-এর ন্যায় হাদীস বিশারদ বিদ্বানের ওপর অপবাদ দেওয়া।

২- ইবন আরাবী ইয়াহূদী, খৃস্টান, পৌত্তলিক ও দীন ইসলামসহ সকল ধর্মের সমন্বয়ে এক ধর্ম গণ্য করা প্রসঙ্গে বলেন,

وقد كنت قبل اليوم أنكر صاحبي إذا لم يكن ديني
إلى دينه دان

فأصبح قلبي قابلا كل حـــالة فمرعي لغزلان
ودير لرهبان

وبيت لاوثان وكعبـــة طائف وألواح توراة
ومصحف قرآن

“যখন ছিল না তার ধর্মে

ধর্মাধীন ধর্ম আমার

ঘৃনিতাম তখন সাথীরে আমি

দিন পূর্ব আজিকার

আজি হৃদয় আমার প্রসন্ন

স্বাগতের তরে সব হালত

কি হরিণের চারণ ভূমি

কি পাদরীর গৃহ ইবাদত।

মূর্তিগৃহ হোক আর তাওয়াফকারী

কা‘বা হোক, হোক তা

তাওরাতের খণ্ড, হোক

পাণ্ডুলিপি কুরআনের।”

আল-কুরআনে ইবন আরাবীর উক্ত কথার খণ্ডন করতঃ আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَن يَبۡتَغِ غَيۡرَ ٱلۡإِسۡلَٰمِ دِينٗا فَلَن يُقۡبَلَ مِنۡهُ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٨٥﴾ [ال عمران: ٨٥]

“আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো দীন (ধর্ম) তালাশ করে, কষ্মিনকালেও তা গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে হবে ক্ষতিগ্রস্ত।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৮৫]

৩- ইবন আরাবী এই ধারণা করে যে, আল্লাহই সৃষ্টি, আর সৃষ্টিই আল্লাহ। তারা উভয়ে একে অন্যের ইবাদত করে। সে তার নিম্নোক্ত বাণী দ্বারা তা উদ্দেশ্য করে। (সে বলে) :

فيحمدني وأحمده ويعبدني وأعبده

“তিনি আমার প্রশংসা করেন এবং আমিও তার প্রশংসা করি। আর তিনি আমার ইবাদত করেন এবং আমিও তার ইবাদত করি।”

৪- ইবন আরাবী স্বীয় ‘ফুসুস’ গ্রন্থে বলে :

إن الرجال حينما يضاجع زوجته إنما يضاجع الحق

“নিশ্চয় কোনো ব্যক্তি যখন তার সাথে স্ত্রীর সাথে আলিঙ্গন করে সে ‘হক’ তা‘আলাকেই আলিঙ্গন করে।” – নাউযুবিল্লাহ।

৫- সূফী নাবলুসী উক্ত কথার ব্যাখ্যায় বলে : إنما ينكح الحق অর্থাৎ “সে অবশ্যই ‘হক’ তা‘আলার সাথে সহবাস করে।” – নাউযুবিল্লাহ।

৬- সূফী আবু ইয়াযিদ আল-বুস্তামী আল্লাহকে সম্বোধন করে বলেন, “(হে আল্লাহ!) আমাকে তোমার ওয়াহদানিয়্যাত বা একত্ববাদে মণ্ডিত কর! আমাকে তোমার রাব্বানিয়্যাতের বসন পরিধান করিয়ে দাও! আর আমাকে তোমার একত্ববাদের মঞ্জিলে উঠিয়ে

নাও, যাতে তোমার সৃষ্টি যখন আমাকে দেখে, তখন তারা যেন বলে : ‘আমরা তোমাকেই দেখেলাম।’

আর সে তার নিজের সম্বন্ধে বলে :

سبحاني سبحاني، ما أعظم شأني، الجنة لعبة صبيان

“আমি পবিত্রময় সত্তা, কতই না, বড় আমার শান। জান্নাত বালকের খেলনা ছাড়া তো কিছু নয়!”

৭- জালালুদ্দীন রুমী বলেন, আমি মুসলিম তবে আমি খৃস্টান ও যরাদাশ্তী। আমার একক কোনো ইবাদতগৃহ নেই; বরং মসজিদ, গীর্জা অথবা মূর্তিগৃহ সবই সমান।

৮- ইবনুল ফারিদ্ব স্বীয় আত-তায়িয়াহ কাব্যে বলেন, ক্বায়েসের জন্য লায়লার আকৃতিতে, কুছাইয়্যের এর জন্য ‘আযযার আকৃতিতে এবং জামিল-এর জন্য বুছায়নার আকৃতিতে আল্লাহই নূরের ঝলকরূপে প্রকাশ পেয়েছেন। সে স্বীকার করে যে, এটি হক তা‘আলার তজল্লির অংশ বিশেষ।

৯-সূফী রাবে‘আহ আদওয়িয়াহ (রাবেয়া বসরী) কে জিজ্ঞাসা করা হলো: তুমি কি শয়তানকে অপছন্দ কর? জবাবে সে বলল : “আল্লাহর জন্য আমার ভালোবাসা আমার অন্তরে কাউকে অপছন্দ করা অবশিষ্ট রাখে না।” আর সে আল্লাহকে সম্বোধন করতঃ বলে :

(হে আল্লাহ!) আমি যদি তোমার জাহান্নামের ভয়ে তোমার ইবাদত করে থাকি, তাহলে সে জাহান্নামের অগ্নি দ্বারা আমাকে পুড়িয়ে মার!” অথচ আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নাম থেকে সতর্ক করেন। তিনি বলেন,

﴿قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا﴾ [التحريم: ٦]

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবারবর্গকে জাহান্নাম থেকে বাঁচাও!” [সূরা আত-তাহরীম, আয়াত: ৬]

উক্ত সূফী নারী রাবে‘আহ প্রসঙ্গে তারা বলেন, সে ছিল একজন গায়িকা ও বাদক বাজানেওয়ালী মেয়ে। তাই কী করে

কুরআনের বিপরীতে তার কথা গ্রহণ করা যায়?

১০- সুদানের নব্য সূফী শাইখ উসমান আল-বুরহানী[১৫] একটি কিতাব রচনা করেন, যার নামকরণ করেন “ইনতেসারু আউলিয়া-ইর রাহমান আলা আউলিয়া-ইশ-শাইত্বান।” এ গ্রন্থে সে ‘আউলিয়া-উশ-শাইত্বান’ দ্বারা শাইখুল ইসলাম মুহাম্মাদ ইবন আবদুল ওয়াহহাবের অনুসারী সহীহ আকীদার ধারক-বাহক এবং ইখওয়ানুল মুসলিমীনের আলেমদেরকে উদ্দেশ্য নিয়ে।

সূফীদের করামতসমূহ

সূফীরা ধারণা করে যে, তাদের কিছু ওলী আউলিয়া আছেন যাদের অনেক কারামত আছে। এক্ষণে তাদের আউলিয়া কর্তৃক প্রকাশিত কিছু কারামত আমি সম্মানিত পাঠকদের খিদমতে পেশ করব। তাতে দেখা যাবে যে, এগুলো সবই উদ্ভব, ভ্রষ্টতা ও কুফুরী। শা‘রানী প্রণীত ‘আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা’-এর বর্ণনা মতে সূফী আউলিয়াদের কারামতসমূহ:

১- আর তিনি (জনৈক সূফী সাধক) খৃস্টানদের পাগড়ীর ন্যায় নক্শা করা একটি হালকা পাগড়ী পরিধান করতেন। আর তার দোকানটি দুর্গন্ধযুক্ত ও নোংরা ছিল। যত মরা কুকুর ও দুম্বা পেতেন তা তিনি দোকানের ভিতরে রেখে

দিতেন। সে জন্য কেউ তার নিকট বসতে পারত না। আর তিনি মসজিদের দিকে রওয়ানা হয়ে রাস্তায় কুকুরের পানি পান করার পাত্র থেকে পবিত্রতা অর্জন (অযু) করতেন। অতঃপর গাধার প্রস্রাবের স্থান দিয়ে অতিক্রম করতেন।

২- আর তিনি যখন কোনো মহিলা অথবা দাঁড়ি গজাবার পূর্বেকার কোনো কিশোরকে দেখতে পেতেন, তখন তিনি তার প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে পড়তেন। আর তার নিতম্ব স্পর্শ করতেন। চাহে সে আমীর অথবা মন্ত্রীর ছেলে হোক। এমনকি যদিও তার পিতা অথবা অন্য যে কারো উপস্থিতিতে হোক। এ

ক্ষেত্রে তিনি কোনো মানুষের প্রতি তাকাতেন না।

৩- শা‘রাণী তার সূফী গুরু আলী উহাইশ সম্পর্কে বলেন, তিনি যখন শহরের কোনো প্রধান বা অন্য কাউকে দেখতে পেতেন, তখন তাকে গাধার উপর থেকে নামিয়ে দিতেন। আর তাকে বলতেন, গাধাটির মাথা ধরো, যাতে এটির সাথে মিলন করি। যদি শহরের প্রধান এতে অস্বীকার করতেন তাহলে তিনি তাকে জমিতে (পেরেগ মেরে আটকানোর ন্যায়) আটকিয়ে রাখতেন। ফলে, তিনি এক কদমও চলতে পারতেন না।

৪- শা‘রাণী তার সূফী গুরু মুহাম্মাদ আল-খুজারী সম্পর্কে বলেন, শাইখ আবুল ফাযল আস-সারসী জানান যে, একদা কোনো এক জুমু‘আয় তিনি তাদের মাঝে আগমন করলেন। অতঃপর তারা তার নিকট খুতবা দানের আহ্বান জানালো। তিনি মিম্বরে আরোহন করে আল্লাহর একক প্রশংসা ও গুণগানের পর বললেন:

أشهد أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام

“আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, ইবলিস ‘আলাইহিস সালাম ব্যতীত তোমাদের কোনো ইলাহ নেই।” (নাউযুবিল্লাহ) অতঃপর জনগণ বলে উঠল : লোকটি কুফুরী করেছে। তখন তিনি তরবারী

উচিয়ে মিম্বর থেকে নেমে পড়লেন। আর সকল জনগণ জামে মসজিদ থেকে (ভয়ে) পালিয়ে গেল।

অতঃপর তিনি আসরের আযান পর্যন্ত মিম্বরে বসে থাকলেন। কারো সাহস হলো না জামে মসজিদে প্রবেশের। এরপর পার্শ্ববর্তী শহরের কিছু লোক আসল। প্রত্যেক শহরের লোকেরা বলল, তিনি তাদের নিকট খুতবা দিয়েছেন ও তাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করছেন। আমরা গুণে দেখলাম সেদিনও তার প্রদত্ত খুতবা ছিল ৩০টি। অথচ দেখছি তিনি আমাদের এখানে খুতবায় বসা[১৬]।

সুফীবাদের নিকট জিহাদ

সূফীবাদের নিকট জিহাদ খুবই কম। তাদের ধারণা মতে তারা নিজেদের নফসের সাথে জিহাদে ব্যস্ত। তারা (তাদের মতের সমর্থনে) একখানা হাদীস বর্ণনা করেন যা শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. উল্লেখ করেন। আর সেটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر وهو جهاد النفس»

“আমরা ছোট জিহাদ থেকে বড় জিহাদের দিকে ফিরে এলাম। আর তা হচ্ছে- নফসের জিহাদ।” তবে এই হাদীসটি বিদ্বানদের কেউ নবী

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা-এর বাণীসমূহ থেকে বর্ণনা করেন না। বরং কুরআন ও সুন্নাহর স্পষ্ট বক্তব্য এই যে, কাফিরদের সাথে জিহাদ করা আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায়সমূহের মাঝে সবচেয়ে বড়। এখানে জিহাদ সম্পর্কে সূফীবাদের কিছু কথা উদ্ধৃত করা হলোঃ

১- শা‘রাণী বলেন, আমাদের থেকে এই মর্মে অঙ্গীকার গৃহীত হয়েছে যে, আমরা আমাদের ভাইদেরকে আদেশ দেব যেন তারা যুগ ও সে যুগের অধিবাসীদের সাথে তাল মিলিয়ে চলে। তাদের ওপর আল্লাহ কাউকে মঞ্জিল দান করলে তাকে যেন তারা কখনও

তুচ্ছ মনে না করে। যদিও দুনিয়া ও দুনিয়ার নেতৃত্বের বিষয় হয়।

২- ইবন ‘আরাবী বলেন, নিশ্চয় আল্লাহ যখন কোনো জাতির ওপর কোনো যালিম শাসক চাপিয়ে দেন, তখন তার বিরুদ্ধে উত্থান করা ওয়াজিব নয়। কেননা সে আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদের জন্য শাস্তিস্বরূপ।

৩-দু’জন বড় সূফী নেতা ইবন আরাবী ও ইবনুল ফারিদ্ব ক্রুসেড যুদ্ধের সময় জীবিত ছিলেন। কিন্তু তাদের কাউকে যুদ্ধে অংশ নিতে অথবা যুদ্ধের প্রতি আহ্বান জানাতে কিংবা তারা তাদের কোনো কবিতায় অথবা গদ্যে মুসলিমদের ওপর নেমে আসা বেদনায়

অনুভূতি প্রকাশ করতে আমরা শুনি না। উপরন্তু তারা মানুষকে দৃঢ়তা দিয়ে বলতেন: “নিশ্চয় আল্লাহ সবকিছু দেখছেন। কাজেই মুসলিমগণ ক্রুসেডারদেরকে ছেড়ে দিক! তারা তো ঐ আকৃতিতে আল্লাহর সত্তা বৈ আর কিছু নয়। [১৭]

৪- গাযালী স্বীয় ‘আল মুনক্বিয মিনাদ্ব দ্বালাল’-গ্রন্থে সূফীবাদের ত্বরীকা অনুসন্ধানকালে বলেন, ক্রুসেডে যুদ্ধের সময় তিনি কখনও দামেস্কের গুহায় আবার কখনও বাইতুল মুকাদ্দাসের বড় পাথরের আড়ালে নির্জনে ধ্যানমগ্ন ছিলেন। আর দু’বৎসরের অধিককাল পর্যন্ত তিনি

উভয় নির্জন কক্ষের দরজা বন্ধ করে রাখতেন। অতঃপর যখন ক্রুসেডারদের হাতে ৪৯২ হিজরী সনে বাইতুল মুকাদ্দেসের পতন ঘটল, তখন গাযালী সামান্য বীরের লড়াইও করেন না। এমন কি তা পুনরুদ্ধারের জন্যও জিহাদের ডাকও দেন না। অথচ তিনি বাইতুল মাকাদিসের পতনের পর আরও ১২ বৎসর জীবিত ছিলেন।

আর তিনি তার কিতাব ইহ্ইয়াউ উলুমিদ্ দীন’-এ জিহাদ বিষয়ে মোটেও কোনো আলোচনা করেন না। বরং তিনি এতে অনেক কারামত বিষয়ে আলোচনা করেছেন, যা সবই অবান্তর ও কুফুরী।[১৮]

৫- ‘তারিখুল আরবিল হাদীছ ওয়াল মাআসির’ গ্রন্থ প্রণেতা উল্লেখ করেন যে, সূফীবাদের অনুসারীরা অনেক অবান্তর ও বিদ‘আতের প্রসার ঘটিয়েছে। আর তারা যুদ্ধের বেলায় পিছু টান পথ এখতিয়ার করেছে। এমন কি সাম্রাজ্যবাদীরা তাদেরকে তাদের পক্ষে গোয়েন্দাদের ন্যায় ব্যবহার করেছে।

৬- মুহাম্মাদ ফহির শাক্বফা আস-সুরী স্বীয় ‘আত-তাসাউফ’ গ্রন্থের ২১৭ পৃষ্ঠায় বলেন, বাস্তবতা ও ঐতিহাসিক সত্যের আলোকে আমাদের প্রতি আবশ্যক যেন আমরা উল্লেখ করি যে, সিরিয়ায় ফরাসী উপনিবেশকালে তারা

সূফীবাদের তিজানীয়াহ ত্বরীকার প্রসারে চেষ্টা করেছিল। এটাকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য ফরাসী শাসক শ্রেণী কতিপয় সুফী পীরকে ভাড়া করেছিল। ফ্রান্সের প্রতি ঝুঁকে যায় এমন একটি জাতি তৈরির জন্য তারা তাদের প্রতি সম্পদ ও সম্মান পেশ করেছিল। কিন্ত মরক্কোর মুজাহিদরা দেশের নিষ্ঠাবান ব্যক্তিবর্গকে তিজানীয়া ত্বরীকার ভয়াবহতা সম্পর্কে সংগ্রাম করতে সতর্ক ভূমিকা পালন করে। (তারা বুঝাতে সক্ষম হয় যে, ধর্মীয় লেবাসে এটি একটি ফরাসী উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার কূটকৌশল। ফলে, প্রচণ্ড প্রতিবাদের মুখে উপনিবেশবাদীদের

হাত থেকে দামেস্কের পুরো পতন ঘটে।”

সুফীদের নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য

অধিকাংশ মানুষের নিকট ওলী দ্বারা উদ্দেশ্য ঐ ব্যক্তি যার ক্ববের বড় গম্বুজ থাকে অথবা যাকে মসজিদে দাফন করা হয়। আর কথিত এই ওলীর প্রতি কখনও এমন অসত্য অবান্তর কোনো কোনো কারামত জুড়িয়ে দেওয়া হয়। যাতে (সাধারণ জনগণকে ধোকা দিয়ে) তারা অন্যায়ভাবে মানুষের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ ও ভক্ষণ করতে পারে। আর গম্বুজের চিন্তা ও বিদ‘আতী আচার-অনুষ্ঠান যা দ্রুজ নামীয় শি‘আ ফিরকা উদ্ভাবন করেছে

এবং তারা নিজেদের নামকরণ করেছে ফাতেমী বলে। যাতে তারা মানুষদেরকে মসজিদ থেকে বিমুখ করতে পারে। আর ঐ সমস্ত গম্বুজ ও বিদ‘আতী আড্ডার মূলতঃ কোনো ভিত্তি নেই; বরং সবই অবান্তর ও মিথ্যা। এমন কি হুসাইন রাদিয়াল্লাহু আনহুর কবরও মিসরে নেই। তিনি তো ইরাকে শহীদ হয়েছিলেন। আর মসজিদে দাফন করা ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের কাজ; যা থেকে রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করেছেন। তিনি বলেন,

«لَعَنَ اللَّهُ اليَهُودَ وَالنَّصَارَى، اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسْجِدًا»

“ইয়াহূদী ও খৃস্টানদের প্রতি আল্লাহর লা‘নত। তারা তাদের নবীদের কবরসমূহকে মসজিদ হিসেবে গ্রহণ করেছে।”[১৯]

কোনো কোনো মানুষ ধারণা করে যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তার মসজিদেই দাফন করা হয়েছিল। এটি একটি বড় ভ্রান্ত ও মিথ্যা কথা; কেননা, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর বাসগৃহেই দাফনপ্রাপ্ত হয়েছিলেন। উমাইয়া শাসন পূর্ব পর্যন্ত ৮০ বৎসর কালব্যাপী তাঁর কবর সেই অবস্থায়ই ছিল। অতঃপর উমাইয়া শাসকগণ

প্রশস্ত করে কবরকে তাতে শামিল করে নেয়।[২০]

অনেক মুসলিম তাদের মৃতদেরকে মসজিদে দাফন করে থাকেন। বিশেষতঃ কোনো পীর হলে তো আর কথা নেই। অতঃপর দীর্ঘকাল অতিবাহিত হলেই তাতে গম্বুজ তৈরি করেন এবং তার চতুর্পাশ্বে তাওয়াফ করেন। আর (এভাবেই) তারা শির্কে পতিত হয়ে যান। অথচ মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَأَنَّ ٱلۡمَسَٰجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدۡعُواْ مَعَ ٱللَّهِ أَحَدٗا ١٨﴾ [الجن: ١٨]

“আর নিঃসন্দেহে সাজদার স্থানসমূহ কেবল আল্লাহর। অতএব, আল্লাহর

সাথে আর কাউকেও ডেকো না।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ১৮]

ইসলামের মসজিদসমূহ মৃতদের দাফনের কবরস্থান নয়; বরং সেগুলো সালাত ও এককভাবে আল্লাহর ইবাদতের জন্য। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لَا تُصَلوا إلى الْقُبُورِ، وَلَا تجلسوا عليهَا»

“কবরের দিকে মুখ করে তোমরা সালাত আদায় কর না এবং কবরের উপরে তোমরা বসো না।”[২১]

হে মুসলিম ভাই! কবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা অথবা তাতে উপবেশন থেকে সতর্ক হউন।

আর-রহমান-এর আউলিয়া

১- আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿أَلَآ إِنَّ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ لَا خَوۡفٌ عَلَيۡهِمۡ وَلَا هُمۡ يَحۡزَنُونَ ٦٢ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ ٦٣﴾ [يونس: ٦٢، ٦٣]

“অবহিত হও! যারা আল্লাহর বন্ধু তাদের কোনো ভয় নেই। আর তারা চিন্তিতও হবে না; যারা ঈমান এনেছে ও তাকওয়া অবলম্বন করেছে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৬২-৬৩]

২- আল্লাহ আরও বলেন,

﴿إِنۡ أَوۡلِيَآؤُهُۥٓ إِلَّا ٱلۡمُتَّقُونَ﴾ [الانفال: ٣٤]

“মুত্তাকীরাই কেবল আল্লাহর ওলী।” [সূরা আল-আনফাল, আয়াত: ৩৪]

৩- আল কুরআনে ওলী বলতে ঐ মুসলিমকে বুঝায়, যে আল্লাহকে তাকওয়া অবলম্বন করে চলে; তার নাফরমানী করে না। তাকেই ডাকে, তার সাথে কাউকে শরীক করে না। এই ধরনের পরহেজগার ব্যক্তিকে কষ্ট দেওয়া তার প্রতি সীমালঙ্ঘন করা ও তার সম্পদ ভক্ষণ করা থেকে আল্লাহ সাবধান করে দিয়েছেন। হাদীসে কুদসিতে আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

«مَنْ عَادَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ آذَنْتُهُ بِالحَرْبِ.....»

“যে ব্যক্তি আমার কোনো ওলীর ওপর শত্রুতা/সীমালঙ্ঘন করবে, আমি তার সাথে যুদ্ধের ঘোষণা দিলাম ...।”[২২]

কখনও এই ধরনের তাওহীদবাদী আল্লাহর আনুগত্যশীল মুসলিম ওলীর দ্বারা মহান আল্লাহ প্রয়োজনের ক্ষেত্রে কখনও কোনো কারামত প্রকাশ ঘটিয়ে তাকে সম্মানিত করেন। এ ধরনের বেলায়েত/বন্ধুত্ব ও কারামতের কথা কুরআনুল কারীমে সাব্যস্ত রয়েছে। এর প্রমাণে মারইয়াম আলাইহাস সালাম-এর ঘটনা প্রণিধানযোগ্য। তিনি আপন গৃহে থেকেই যখন রিযিক ও খাদ্য প্রাপ্ত হতেন। তার শানে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿كُلَّمَا دَخَلَ عَلَيۡهَا زَكَرِيَّا ٱلۡمِحۡرَابَ وَجَدَ عِندَهَا رِزۡقٗاۖ قَالَ يَٰمَرۡيَمُ أَنَّىٰ لَكِ هَٰذَاۖ قَالَتۡ هُوَ مِنۡ عِندِ ٱللَّهِۖ إِنَّ ٱللَّهَ يَرۡزُقُ مَن يَشَآءُ بِغَيۡرِ حِسَابٍ﴾ [آل عمران: ٣٧]

“যখনই যাকারিয়া মিহরাবে তার (মারইয়ামের) কাছে আসতেন তখনই কিছু খাবার দেখতে পেতেন। জিজ্ঞেস করতেন: মারইয়াম! কোথা থেকে এসব তোমার কাছে এলো? তিনি বলতেন: এসব আল্লাহর নিকট থেকে এসেছে। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা বেহিসাব রিযিক দান করেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ৩৭] অতএব, ওলায়েত ও কারামত প্রমাণিত। তবে তা কেবল আনুগত্যশীল তাওহীদবাদী মুমিন থেকেই প্রকাশ পাবে। সালাত পরিত্যাগকারী অথবা গুনাহে লিপ্ত কোনো ফাসিক ব্যক্তি কর্তৃক প্রকাশ পাওয়া সম্ভব নয়। উপরন্তু কারামত প্রকাশ হওয়ার জন্য ওলী

হওয়ার শর্তারোপও করা হয় না, বরং কুরআনুল কারীম শর্ত করেছে কেবল ঈমান ও তাক্বওয়াকে।

শয়তানের আউলিয়া

গোনাহের ওপর আস্ফালন করা কিংবা গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা ফাসিক ও মুশরিকদের কাজ। এ ধরনের পাপী/মুশরিক ব্যক্তি কী করে সম্মানিত আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে? অনুরূপভাবে কারামত বাপ–দাদার পৈত্রিক সম্পত্তি সূত্রেও হয় না; বরং তা ঈমান ও নেক কর্ম দ্বারা হয়। এমনিভাবে কারামত প্রকাশ পেতে পারে না কোনো বিকৃতকারীর হাতে। যারা তাদের গায়ে তরবারীর আঘাত করা

অথবা আগুন খেয়ে ফেলার দ্বারা কারামতের দাবী করে। কেননা তা শয়তান ও অগ্নিপূজকদের কাজ। তাদের দ্বারা এ জাতীয় কিছু সংঘটিত হওয়া (আল্লাহর পক্ষ থেকে) ইস্তেদরাজ বা ছাড় প্রদান মাত্র, যেন তারা ভ্রষ্টাতায় নিপতিত হয়ে পড়ে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿مَن يَعۡشُ عَن ذِكۡرِ ٱلرَّحۡمَٰنِ نُقَيِّضۡ لَهُۥ شَيۡطَٰنٗا فَهُوَ لَهُۥ قَرِينٞ ٣٦﴾ [الزخرف: ٣٦]

“যে ব্যক্তি রহমানের স্মরণ থেকে চোখ ফিরিয়ে নেয়, আমরা তার জন্য এক শয়তান নিয়োজিত করে দেই, অতঃপর সে-ই হয় তার সঙ্গী।” [সূরা আয-যুখরুফ, আয়াত: ৩৬]

এ ধরনের কর্মকাণ্ড ইসলাম সমর্থন করে না। কেননা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা করেন নি এবং তাঁর পরে তাঁর সাহাবীগণও তা করেন নি। সেটি নতুন আবিষ্কৃত বিদ‘আতের অন্তর্ভুক্ত, সে সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ»

“তোমরা নবাবিষ্কৃত বিষয়াদি থেকে বেঁচে থাকো। কেননা সকল নবাবিষ্কৃত বিষয়ই হচ্ছে বিদ‘আত। আর প্রত্যেক বিদ‘আতের পরিণাম ভ্রষ্টতা।”[২৩]

ভারতবর্ষের কাফিরগণ এর চেয়ে বেশি (অলৌকিক কাণ্ড করে থাকে। যেমনটি ইবন বাতুতা তার ভ্রমণ কাহিনীতে এবং শাইখুল ইসলাম ইবন তাইমিয়্যাহ রহ. স্বীয় কিতাবসমূহে তাদের উদ্ধৃতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন। তবুও কি আমরা তাদের তরফ থেকে বলব যে, তাদের আউলিয়াদের কারামত রয়েছে (?) বরং এটি শয়তানী কর্ম। এর সম্পাদনকারীকে কঠিনভাবে ভ্রষ্টতায় নিক্ষেপের জন্য এটি একটি ছাড় মাত্র। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ مَن كَانَ فِي ٱلضَّلَٰلَةِ فَلۡيَمۡدُدۡ لَهُ ٱلرَّحۡمَٰنُ مَدًّاۚ﴾ [مريم: ٧٥]

“বলুন! যারা গুমরাহীতে আছে, দয়াময় আল্লাহ তাদেরকে যথেষ্ট অবকাশ দিবেন।” [সূরা মারইয়াম, আয়াত: ৭৫]

ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱدۡعُوهُ خَوۡفٗا وَطَمَعًا﴾ [الاعراف: ٥٦]

“আর তোমরা তাঁকে (আল্লাহ) ডাকো ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা সহকারে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৬]

মহান পবিত্রময় আল্লাহ তাঁর জাহান্নামের আযাবের ভয়ে এবং জান্নাত ও নি‘আমতের আশায় তাঁর বান্দাদেরকে তাদের স্রষ্টা ও মা‘বূদকে ডাকার (ইবাদতের) জন্য

আদেশ করেন। যেমন, আল্লাহ তা‘আলা সূরা হিজর-এর মধ্যে বলেন,

﴿نَبِّئۡ عِبَادِيٓ أَنِّيٓ أَنَا ٱلۡغَفُورُ ٱلرَّحِيمُ ٤٩ وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ ٱلۡعَذَابُ ٱلۡأَلِيمُ ٥٠﴾ [الحجر: ٤٩، ٥٠]

“আপনি আমার বান্দাদেরকে জানিয়ে দিন, নিঃসন্দেহে আমি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়ালু। আর আমার শাস্তিই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৪৯-৫০]

কেননা আল্লাহর ভয় বান্দাকে তাঁর নাফরমানী ও নিষিদ্ধ বিষয়াদি থেকে দূরে রাখতে উদ্বুদ্ধ করে। আর তাঁর জান্নাত রহমত লাভের আশা বান্দাকে নেক আমল সম্পাদন ও যেসব কাজ তার

রবকে সন্তুষ্ট করে, তা আদায় করতে অধিক আগ্রহান্বিত করে।

এই আয়াত যা যা নির্দেশ করে :

১- বান্দা তার রবকেই ডাকবে, যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই তার ডাক শুনেন ও তার ডাকে সাড়া দেন।

২- আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে না ডাকা। যদিও তিনি নবী, ওলী অথবা ফিরিশতা হোন। কেননা সালাত যেমন ইবাদত; তেমনি দো‘আও একটি ইবাদত, যা আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য (সম্পাদন করা) জায়েয নয়।

৩- বান্দা তার রবকে তাঁর জাহান্নামের ভয়ে ও জান্নাতের আশায় ডাকবে।

৪- অত্র আয়াতটিতে সূফীদের ভ্রান্ত উক্তির খণ্ডন করা হয়েছে। কেননা তারা আল্লাহর ভয়ে কিংবা তাঁর নিকট যে সমস্ত (নি‘আমত) রয়েছে তার আশায় তাঁর ইবাদত করে না। অথচ ভয়-ভীতি ও আশা-আকাঙ্খা ইবাদতের শ্রেণিসমূহের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ এ ভয়-ভীতি ও আশা আকাঙ্খা নিয়ে ইবাদত করার কারণে তার নবীদের প্রশংসা করেন, যারা শ্রেষ্ঠ মানুষ। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿إِنَّهُمۡ كَانُواْ يُسَٰرِعُونَ فِي ٱلۡخَيۡرَٰتِ وَيَدۡعُونَنَا رَغَبٗا وَرَهَبٗاۖ وَكَانُواْ لَنَا خَٰشِعِينَ﴾ [الانبياء: ٩٠]

“নিশ্চয় তারা সৎ কর্মসমূহে ঝাঁপিয়ে পড়তেন তারা আশা ও ভীতসহ আমাকে

ডাকতেন এবং তারা ছিলেন আমার কাছে বিনীত।” [সূরা আল-আম্বিয়া, আয়াত: ৯০]

৫- অত্র আয়াতটির শিক্ষা দ্বারা ‘আল-আরবাইন আল-নব্বীয়া কিতাবের একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় প্রদত্ত একজন ইমামের কথারও প্রতিবাদ রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণী:

إنما الأعمال بالنيات হাদীসখানার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে ইমাম নববী বলেন, যদি কোনো আমল পাওয়া যায় এবং তার সাথে নিয়তযুক্ত হয়, তাহলে তা ৩টি অবস্থা হয়ে যায়। যথা:

প্রথমত: আমলটি সে সম্পাদন করবে আল্লাহর ভয়ে। আর এটিই একজন দাসের ইবাদত।

দ্বিতীয়ত: আমলটি সে সম্পাদন করবে জান্নাত ও সাওয়াব লাভের উদ্দেশ্যে। আর এটিই একজন ব্যবসায়ীর ইবাদত।

তৃতীয়ত: সে আমলটি সম্পাদন করবে আল্লাহ থেকে লজ্জা করে এবং যথার্থ বন্দেগী ও শুকরিয়া আদায়ের নিমিত্তে। আর এটি একজন স্বাধীন বান্দার ইবাদত।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রতি টিকা নির্দেশ করতঃ সায়্যিদ মুহাম্মাদ রশীদ রিদা স্বীয় ‘মাজমুআতুল হাদীস আন-

নাজদিয়ায়’ বলেন, এ বিভক্তিটি হাদীসের সূক্ষ্ম জ্ঞান সম্পন্ন বিদ্বানদের কথার চেয়ে সূফীদের কথার সাথে অধিকতর সাদৃশ্যশীল। বিশুদ্ধ কথা এই যে, পরিপূর্ণ বন্দেগী হলো ভয়-ভীতি ও আশা-আকাংঙ্খার মাঝে সমন্বয় করা। ভয় সহকারে আমল করা। যাকে তিনি গোলামের ইবাদত বলে আখ্যা দিয়েছেন। অথচ আমরা সবই আল্লাহর গোলাম। আর আল্লাহর সাওয়াব ও অনুগ্রহের আশায় আমল করা যাকে তিনি ব্যবসায়ীদের ইবাদত বলে নামকরণ করেছেন।

আমি বলি! সূফী শাইখ মুতাওয়াল্লী আশ-শা‘রাণী তার পুস্তিকায় এ

আকীদার কথাই বর্ধিত করেছেন। এমন কি তিনি তাতে আরো অতিরঞ্জন করেছেন। আর টেলিভিশনে আল্লাহর বাণী (ولا يشرك بعبادة ربه أحدا) আয়াতাংশের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন, আর তাঁর ইবাদতে কাউকে শরীক করো না। এখানে 'কাউকে' বলতে জান্নাত উদ্দেশ্য। অর্থাৎ জান্নাত লাভের আশায় ইবাদত করা শির্ক।[২৪]

ক্বাসীদাতুল বুরদা সম্পর্কে আপনি কি জানেন?

কবি 'আল-বুসীরী'-এর এই কবিতা/ক্বাসীদা জনগণ বিশেষতঃ সূফীদের নিকট বেশি পরিচিত। যদি আমরা এর অর্থ নিয়ে ভাবি তাহলে

আমরা দেখতে পাব এতে কুরআনুল কারীম ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুন্নাতের অনেক বিরোধিতা রয়েছে। তিনি তার কবিতায় বলেন,

١- يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم

“ওহে সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ তব ভিন্ন মোর নাহি কেহ আর

ব্যাপক মুসীবত আপতিতে আর লইব আশ্রয় কার?”

কবি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করেছেন। আর তাঁকে সম্বোধন করে

বলেন, সাধারণ বিপদ আসলে আশ্রয় প্রার্থনার জন্য আপনি ব্যতীত আর কাউকে আমি পাই না। নিঃসন্দেহে এটি ‘শির্কুল আকবার’ বা বড় শির্ক, যা থেকে তাওবা না করলে মুশরিককে চির জাহান্নামী করে দেয়। সে প্রসঙ্গে আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَدۡعُ مِن دُونِ ٱللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَۖ فَإِن فَعَلۡتَ فَإِنَّكَ إِذٗا مِّنَ ٱلظَّٰلِمِينَ ١٠٦﴾ [يونس: ١٠٦]

“আর আল্লাহ ব্যতীত এমন কাউকে ডেকো না, যে তোমার ভালো করবে না মন্দও করবে না। বস্তুত তুমি যদি এমন কাজ কর, তাহলে তখন তুমিও যালিমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ১০৬]

এখানে যালিমদের অন্তর্ভুক্ত দ্বারা মুশরিকদের অন্তর্ভুক্তি হওয়াকে বুঝানো হয়েছে। কেননা শির্ক হচ্ছে সবচেয়ে বড় যুলুম।

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«مَنْ مَاتَ وَهْوَ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّهِ نِدًّا دَخَلَ النَّارَ»

“যে ব্যক্তি মারা যাবে এমতাবস্থায় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে (অর্থাৎ আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করে) ডাকে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে।”[২৫]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٢- فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علمك علم اللوح والقلم

“দুনিয়া ও তাতে আছে যা সব তোমার বদান্যতা

লৌহ ও কলম-এর ইলম যে তোমার বিদ্যাবত্তা।”

এটিও কুরআনকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। কেননা কুরআনে আল্লাহ বলেন,

﴿وَإِنَّ لَنَا لَلۡأٓخِرَةَ وَٱلۡأُولَىٰ ١٣﴾ [الليل: ١٣]

“আর নিশ্চয় আমরা ইহকাল ও পরকালের মালিক।” [সূরা আল-লাইল, আয়াত: ১৩]

কাজেই দুনিয়া ও আখিরাত আল্লাহর পক্ষ থেকে আল্লাহরই সৃষ্টির অন্তর্গত। তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বদান্যতা ও তাঁর সৃষ্টি নয়। আর লাওহে মাহফূযে যা কিছু আছে, তার ইলম রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাখেন না। একক আল্লাহ ব্যতীত এর ইলম আর কেউ জানে না। সুতরাং তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রশংসায় সীমালংঘন ও অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি। যার ফলে স্থির করেছে- দুনিয়া ও আখিরাত তাঁর)সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) বদান্যতারই ফল এবং লাওহে মাহফূযের ইলম তিনি জানেন- এই ধারণা। বরং তাঁর

জ্ঞানেরই ফল। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে এরূপ বাড়াবাড়ি থেকে নিষেধ করতঃ বলেন,

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

“মারইয়াম তনয় ঈসাকে নিয়ে খৃস্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না! আমি তো কেবল একজন বান্দা। অতএব, তোমরা বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”[২৬]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٣- ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت
جوارا منه لم يضم

যুগের দাহন পীড়া ক্লিষ্ট বেদনায়

চেয়েছি যত সান্নিধ্য তা পেয়েছি দুর্লভ আশ্রয়।”

অর্থাৎ কবি বলেন, যে কোনো রোগ-ব্যাধি অথবা দুশ্চিন্তায় যখন তাঁর নিকট শেফা চেয়েছি অথবা দুশ্চিন্তা মুক্তি চেয়েছি, তিনি আমাকে শেফা করেছেন এবং আমার চিন্তামুক্ত করে দিয়েছেন।

অথচ কুরআনে কারীমে ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালাম-এর বাচনিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করে বর্ণিত হয়েছে:

﴿وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠﴾ [الشعراء: ٨٠]

“আর যখন আমি অসুস্থ হই, তিনিই (আল্লাহ) আমাকে আরোগ্য প্রদান করেন।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৮০]

আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَ﴾ [الانعام: ١٧]

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা অপসারণকারী কেউ নেই।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৭]

আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»

“যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছে করবে। আর যখন সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাইবে।”[২৭]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٤ـ فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم

“রেখেছি নাম মুহাম্মাদ তাই চুক্তি তার সাথে আমার

তিনিইতো শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি পূরণে অঙ্গিকার।”

কবি বলতে চান! আমার নাম মুহাম্মাদ। সে কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমার চুক্তি রয়েছে যে, তিনি আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

এই চুক্তি সে কোত্থেকে পেল? অথচ আমরা জানি, অনেক ফাসিক ও সমাজতান্ত্রিক মুসলিমের নাম রয়েছে মুহাম্মাদ। তবে কি মুহাম্মাদ নামে নামকরণই তাদেরকে জান্নাতে নিষ্কলুষ প্রবেশ করিয়ে দিবে? অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কন্যা ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু আনহাকে লক্ষ্য করে বলেন,

«سَلِينِي مَا شِئْتِ مِنْ مَالِي لاَ أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا»

“(হে ফাতেমা!) যা ইচ্ছা আমার সম্পদ থেকে চেয়ে নাও! (রোজ কিয়ামতে) আল্লাহর হকের বেলায় আমি তোমার কোনো উপকারে আসব না।”[২৮]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٥- لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم

“আমার রবের রহমতে যবে বন্টন হয় সম্ভবতে

ভাগে আসে তা নাফরমানীর পরিমাণ মতে।”

তা সম্পূর্ণ অসত্য কথা। কারণ যদি নাফরমানী অনুপাতে রহমতের পরিমাণ আসত, তাহলে কবির কথা অনুযায়ী অধিক রহমত লাভের আশায় বেশি নাফরমানী করা মুসলিম-এর ওপর আবশ্যক হয়ে পড়ত। এ ধরনের কথা কোনো মুসলিম ও জ্ঞানী বলতে পারে না। কেননা তা আল্লাহর বাণীর বিপরীত। আল্লাহ বলেন,

﴿إِنَّ رَحۡمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٞ مِّنَ ٱلۡمُحۡسِنِينَ﴾ [الاعراف: ٥٦]

“নিশ্চয় আল্লাহর রহমত সৎকর্মশীলদের নিকটবর্তী।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ৫৬]

আল্লাহ তা‘আলা আরো বলেন,

﴿وَرَحۡمَتِي وَسِعَتۡ كُلَّ شَيۡءٖۚ فَسَأَكۡتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤۡتُونَ ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلَّذِينَ هُم بِـَٔايَٰتِنَا يُؤۡمِنُونَ﴾ [الاعراف: ١٥٦]

“আর আমার রহমত সব কিছুর উপর পরিব্যাপ্ত। সুতরাং তা তাদের জন্য লিখে দেব- যারা তাকওয়া অবলম্বন করে, যাকাত দান কর এবং যারা আমার আয়াতসমূহের ওপর ঈমান আনে।” [সূরা আল-আ‘রাফ, আয়াত: ১৫৬]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٦- وكيف تدعوا إلى الدنيا ضرورة من لولاه لم تخرج الدنيا من العدم

“প্রয়োজনের তরে দুনিয়ার দিকে

কেমন কর তুমি আহ্বান,

অথচ, যে (মুহাম্মাদ) না হলে না হত

শূন্য থেকে দুনিয়ার উত্থান।”

কবি বলেন, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম না হলে দুনিয়া সৃষ্টি হতো না। আল্লাহ তার এ কথা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি মানব ও জিন্ন জাতিকে কেবল আমার ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

এমনকি ইবাদতের জন্য ও এর প্রতি দাওয়াতের জন্য স্বয়ং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সৃষ্টি করা হয়েছে। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَٱعۡبُدۡ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأۡتِيَكَ ٱلۡيَقِينُ ٩٩﴾ [الحجر: ٩٩]

“ইয়াকীন তথা মৃত্যু আসা পর্যন্ত তুমি তোমার রবের ইবাদত কর!” [সূরা আল-হিজর, আয়াত: ৯৯]

অনুরূপভাবে বুসীরী তার কবিতায় আরও বলেন,

٧- أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم

“কসম করি আমি দ্বি-খণ্ডিত চাঁদের

তাতে আছে কসমের পূর্ণতা,

কেননা মুহাম্মাদের হৃদয়ের সাথে

আছে তার গভীর সখ্যতা।”

কবি চাঁদের কসম খাচ্ছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«من حلف بغير الله فقد أشرك»

“যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে কসম খাবে সে শির্ক করবে।”[২৯]

অতঃপর কবি বুসীরী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সম্বোধন করতঃ বলেন,

٨- لو ناسبت قدره آيته عظيما أحيا اسمه حين
يدعى دراس الرمم

“যদি তাঁর মু‘জিযাসমূহ

মহত্বের সাথে মিশে যায়,

তবেই নাম নিয়ে ডাকলে তাঁর

পঁচাগলা লাশ জীবন পায়।”

অর্থাৎ যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মু‘জিযাসমূহ তাঁর মহত্বের সাথে মিলিত হয়, তাহলে মৃতদেহ যা পচে গলে নিশ্চিহ্ন প্রায় হয়ে গেছে, তা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামের স্মরণেই জীবিত হয়ে ওঠে এবং নড়াচড়া করে। এটি এ কারণে সংঘটিত হচ্ছে না

যে, আল্লাহ তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যথার্থ মু‘জিযা প্রদান করেন নি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে ‘হক’ দেন নি- এ মর্মে এটি যেন আল্লাহর প্রতি প্রতিবাদ করা (নাউযুবিল্লাহ)।

কবির এ কবিতাটি আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করা। কেননা আল্লাহ তা‘আলা প্রত্যেক নবীকে উপযুক্ত মু‘জিযাসমূহ দান করেছেন। যেমন, ঈসা ‘আলাইহিস সালামকে অন্ধ ও কুষ্ঠরোগী ভালো করা এবং মৃত ব্যক্তিকে জীবিত করার মু‘জিযা দান করেছেন। আর আমাদের নবী মুহাম্মাদ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কুরআনুল কারীম, পানি, খাদ্য বৃদ্ধি ও চন্দ্র দ্বি-খণ্ডিত করা ইত্যাদি মু‘জিযা দান করেছেন।

আশ্চর্য কথা যে, কোনো কোনো মানুষ বলে: এই ক্বাসীদা/কবিতাকে বুরদাহ ও বুরাআহ বলা হয়। কেননা তাদের ধারণা মতে এই ক্বাসীদার লেখক অসুস্থ ছিলেন। অতঃপর তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাকে তাঁর জুব্বা দান করে দিলেন। অতঃপর তিনি তা পরিধান করলে রোগ মুক্তি লাভ করেন।

এই ক্বাসীদার গুরুত্ব বাড়ানোর জন্য এটি একটি মিথ্যা বানোয়াট কথা। এ ধরনের কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত বিরোধী কথায় কী করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্তুষ্ট হবেন। অথচ তাতে পরিস্কার শির্ক রয়েছে।

আর জ্ঞাত কথা যে, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) লক্ষ্য করে বলল :

ما شاء الله وشئت

“আল্লাহ যা চান এবং আপনিও যা চান।” তখন তাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন :

«أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده»

“তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থলি করছে? বল আল্লাহ এককভাবে যা চান।”[৩০]

হে মুসলিম ভাই! এই ক্বাসীদা এবং অনুরূপ কুরআন ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিদায়াত বিরোধী কবিতা পাঠ থেকে বিরত হোন! আশ্চর্য এই যে, কোনো কোনো মুসলিম দেশে এ ধরনের আবৃত্তি কথা দ্বারা কবর অভিমুখে

তাদের মরদেহে শোকযাত্রা করে থাকেন। তারা এই ভ্রষ্টতার সাথে আরো একটি বিদ‘আত সংযুক্ত করেন। অথচ জানাযাসমূহ বহনকালে নীরবতা পালন করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আদেশ করেছেন।

لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم

‘দালাইলুল খাইরাত’ কিতাব সম্পর্কে কি জানেন?

মুহাম্মাদ ইবন সুলাইমান আল-জাযূলী প্রণীত ‘দালাইলুল খাইরাত’ কিতাবখানা ইসলামী বিশ্বে ব্যাপক প্রসারিত। বিশেষতঃ মসজিদসমূহে তা বিদ্যমান। মুসলিমগণ বেশি পরিমাণে তা পাঠ করে থাকেন। বরং কখনও তারা কুরআনের

উপরে একে প্রধান্য দেন। আর জুমু‘আর দিনে তো কোনো কথাই নেই।

অর্থনৈতিক ও দুনিয়াবী স্বার্থের লোভে প্রকাশকগণ এর প্রকাশে মেতে ওঠেন। আখিরাতের যে ক্ষতি তাদের পাবে- সেদিকে তারা কোনো নজর দেন না। আমার কাছে যে কপিখানা আছে, তার কভারে লিখা আছে : “আল-হারামাইন প্রেস প্রকাশনা ও বিতরণ সিঙ্গাপুর, জিদ্দা।”

যদি কোনো বিবেকবান স্বীয় ধর্মীয় বিধি বিধানের সম্যক জ্ঞানী মুসলিম কিতাবখানার পাতা উল্টান, তাহলে তাতে শরী‘আত বিরোধী অনেক বড় বড় বিষয়

দেখতে পাবেন। তন্মধ্যে বিশেষ কতিপয় বিরোধিতা নিম্নরূপ :

১- লেখক কিতাবখানার ভূমিকার ১২ পৃষ্ঠায় বলেন, “আমি সুমহান হযরতের সাহায্য প্রার্থনা করি....।” এর দ্বারা তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উদ্দেশ্য করেন।

আমি বলি: এ কথাটি কুরআনুল কারীমের বিপরীত যা আল্লাহ ব্যতীত অন্যের কাছে সাহায্য কামনা জায়েয করে না। আল্লাহ তাঁর প্রজ্ঞাময় কিতাবে বলেন,

﴿بَلَىٰٓۚ إِن تَصۡبِرُواْ وَتَتَّقُواْ وَيَأۡتُوكُم مِّن فَوۡرِهِمۡ هَٰذَا يُمۡدِدۡكُمۡ رَبُّكُم بِخَمۡسَةِ ءَالَٰفٖ مِّنَ ٱلۡمَلَٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِينَ ١٢٥﴾ [ال عمران: ١٢٥]

“অবশ্যই হ্যাঁ, যদি তোমরা সবর কর এবং তাকওয়া অবলম্বন থাকো! আর তারা যদি তখনই তোমাদের ওপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের রব চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফিরিশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন।” [সূরা আলে ইমরান, আয়াত: ১২৫] (সুতরাং সাহায্য কেবল আল্লাহর কাছেই চাইতে হবে, রাসূলের কাছে নয়। [সম্পাদক])

অনুরূপভাবে ‘দালাইলুল খাইরাত’ কিতাবের উপরোক্ত কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীরও বিপরীত। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله»

“যখন তুমি প্রার্থনা করবে, তখন আল্লাহর কাছেই করবে। আর যখন কোনো বিষয়ে সাহায্য চাইবে, তখন আল্লাহর নিকটেই সাহায্য চাইবে।”[৩১]

২- আবুল হাসান আশ-শাযলী নসর বলেন, তা ৭নং টীকায় লিখিত আছে :

يا هو، يا هو، يا هو، يا من بفضله نسألك العجل

“ওহে তিনি, ওহে তিনি, ওহে তিনি, ওহে যার অনুগ্রহ দ্বারা (কামনা করা হয়),

আমরা তোমার নিকট দ্রুততা কামনা করি।”

আমি বলি: ‘তিনি’ শব্দটি আল্লাহর সুন্দর নামসমূহের অন্তর্ভুক্ত নয়; বরং এটি একটি সর্বনাম যা তার পূর্ববর্তী শব্দের প্রতি প্রত্যাবর্তন করে। সে কারণে এর পূর্বে (يا) ‘হে’ সূচক অব্যয় দ্বারা আহ্বান করা জায়েয নয়। যেমনটি সূফীরা করে থাকে। এটি তাদের পক্ষ থেকে একটি বিদ‘আত। আল্লাহর নামসমূহে তারা এমন কিছু বাড়িয়ে থাকেন যা তাঁর (নামসমূহের) মধ্যে নেই।

৩- অতঃপর লেখক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এমন কিছু নাম ও গুণের কথা উল্লেখ

করেন, যা আল্লাহ ব্যতীত কারো জন্য শোভা পায় না। এটি পরিস্কার যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীতেই তাঁর নামসমূহের কথা বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«إِنَّ لِي أَسْمَاءً، أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَنَا أَحْمَدُ، وَأَنَا الْمَاحِي الَّذِي يَمْحُو اللهُ بِيَ الْكُفْرَ، وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَى قَدَمَيَّ، وَأَنَا الْعَاقِبُ الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ أَحَدٌ، وَقَدْ سَمَّاهُ اللهُ رَءُوفًا رَحِيمًا»

“নিশ্চয় আমার কতিপয় নাম রয়েছে : আমি মুহাম্মাদ, আমি আহমদ, আমি মাহী অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তি যে, আমার দ্বারা আল্লাহ কুফুরী মিশিয়ে

দেন। আর আমি আল-হাশির, অর্থাৎ আমি সেই ব্যক্তি যে, আমার পদদ্বয়ের উপর মানুষের হাশর ঘটানো হবে। আর আমি আল-আক্বিব। যার পরে আর কোনো (নবী) নেই। আর আল্লাহ তাঁর নাম রেখেছেন রা‘উফুর রাহীম।”[৩২]

আবূ মূসা আশ‘আরী বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে তাঁর নিজের কতিপয় নাম জানালেন। অতঃপর তিনি বলেন,

«أَنَا مُحَمَّدٌ، وَأَحْمَدُ، وَالْمُقَفِّي، وَالْحَاشِرُ، وَنَبِيُّ التَّوْبَةِ، وَنَبِيُّ الرَّحْمَةِ»

“আমি মুহাম্মাদ (প্রশংসিত), আহমদ (প্রশংসতম), আল-মুক্বাফ্ফা

(সর্বশেষে আগমনকারী), আল-হাশির (সমবেতকারী) নাবীউত তাওবা (তাওবার নবী) ও নাবীউর রাহমাত (রহমতের নবী)।”[৩৩]

৪- রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামসমূহ যা ‘দালাইলুল খাইরাত’ কিতাবে লেখক উল্লেখ করেছেন, তা (উক্ত কিতাবের) ৩৭-৩৮ পৃষ্ঠা দ্রঃ। (আর তা হচ্ছে) মুইয়ি, মুনাজ্জি, নাসির, গাউস, গিয়াছ, সা-হিবুল ফারাজ, কাশিফুল কার্ব ও শাফী।” অর্থাৎ জীবনদাতা, নাজাতদাতা, সাহায্যকারী, ফরিয়াদ শ্রবণকারী, মুক্তিদাতা, বিপদ দূরকারী ও শেফাদাতা।”

আমি বলি: এই সকল নাম ও গুণাবলি আল্লাহ ছাড়া আর কারোর জন্য শোভা পায় না। অতএব, হায়াতদাতা, নাজাতদাতা, সাহায্যদাতা, আশ্রয়দাতা, রোগমুক্তকারী বিপদ-আপদ দূরকারী ও মুক্তিদানকারী হলেন একমাত্র পবিত্র সত্তা আল্লাহ তা‘আলা। আল-কুরআন সে দিকেই নির্দেশনা দিয়েছে। ইবরাহীম ‘আলাইহিস সালামের বাচনিক উদ্ধৃতি উল্লেখ করতঃ আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿ٱلَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهۡدِينِ ٧٨ وَٱلَّذِي هُوَ يُطۡعِمُنِي
وَيَسۡقِينِ ٧٩ وَإِذَا مَرِضۡتُ فَهُوَ يَشۡفِينِ ٨٠ وَٱلَّذِي
يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحۡيِينِ ٨١﴾ [الشعراء: ٧٨، ٨١]

“যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি আমাকে পথ প্রদর্শন করেন। যিনি আমাকে আহার ও পানীয় দান করেন। আর যখন আমি অসুস্থ হই, তখন তিনি আমাকে আরোগ্য দান করেন। যিনি আমার মৃত্যু ঘটাবেন, তিনিই আবার পুনর্জীবন দান করবেন।” [সূরা আশ-শু‘আরা, আয়াত: ৭৮-৮১]

আর আল্লাহ তা‘আলা মানুষকে বলে দেওয়ার জন্য তার রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আদেশ করেন:

﴿قُلۡ إِنِّي لَآ أَمۡلِكُ لَكُمۡ ضَرّٗا وَلَا رَشَدٗا ٢١﴾ [الجن: ٢١]

“বলুন! আমি তোমাদের ক্ষতি সাধন করার ও সুপথে আনয়নের মালিক নই।” [সূরা আল-জিন্ন, আয়াত: ২১]

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿قُلۡ إِنَّمَآ أَنَا۠ بَشَرٞ مِّثۡلُكُمۡ يُوحَىٰٓ إِلَيَّ أَنَّمَآ إِلَٰهُكُمۡ إِلَٰهٞ وَٰحِدٞ﴾ [الكهف: ١١٠]

“বলুন! আমি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার প্রতি ওহী হয় যে, তোমাদের ইলাহ-ই একমাত্র একক ইলাহ।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১১০]

আমি বলি: ‘দালাইলুল খাইরাত’ প্রণেতা কুরআনের খেলাফ করেছেন এবং আসমা ও সিফাতের বেলায়

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সমান করে দেখেছেন। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা থেকে মুক্ত। যদি তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তা শুনতেন, তাহলে এর প্রবক্তাকে শির্কে আকবর তথা বড় শির্ককারী হিসেবে হুকুম দিতেন।

জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আগমন করে তাঁকে বলল :

ما شاء الله وشئت

“আল্লাহ যা চান এবং আপনিও যা চান।” তখনই লোকটিকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বললেন : তুমি কি আমাকে আল্লাহর সমকক্ষ স্থির করেছে? বল! আল্লাহ এককভাবে যা চান।”[৩৪]

আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

«لاَ تُطْرُونِي، كَمَا أَطْرَتْ النَّصَارَى ابْنَ مَرْيَمَ، فَإِنَّمَا أَنَا عَبْدُهُ، فَقُولُوا عَبْدُ اللَّهِ، وَرَسُولُهُ»

“মারইয়াম তনয় ঈসাকে নিয়ে খৃস্টানরা যেভাবে বাড়াবাড়ি করেছে, তোমরা আমাকে নিয়ে সেভাবে বাড়াবাড়ি করো না। আমি তো কেবল একজন বান্দা। অতএব, তোমরা বল: আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল।”[৩৫]

এখানে বাড়াবাড়ি দ্বারা উদ্দেশ্য প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিরঞ্জন করা। আর কিতাব ও সুন্নাতে যা বর্ণিত হয়েছে সেই আলোকে প্রশংসা করা বৈধ।

৫- অতঃপর লেখক স্বীয় গ্রন্থের ৪১-৪২ পৃষ্ঠায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরো কিছু নাম উল্লেখ করেছেন। যেমন, মুহাইমিন, জব্বার ও রূহুল কুদুস। অথচ রাসূলের জন্য এ ধরনের সিফাত কুরআন অস্বীকার করে।

কুরআনে তাঁকে (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) সম্বোধন করে বলা হয়েছে :

﴿ لَّسۡتَ عَلَيۡهِم بِمُصَيۡطِرٍ ٢٢ ﴾ [الغاشية: ٢٢]

“আপনি তাদের ওপর শাসক (শক্তি প্রয়োগকারী) নন।” [সূরা আল-গাশিয়াহ, আয়াত: ২২]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَآ أَنتَ عَلَيۡهِم بِجَبَّارٖ﴾ [ق: ٤٥]

“আপনি তাদের ওপর জোরজবরদস্তিকারী নন।” [সূরা ক্বাফ, আয়াত: ৪৫]

আর রূহুল কুদুস হলেন জিবরীল ‘আলাইহিস সালাম। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ نَزَّلَهُۥ رُوحُ ٱلۡقُدُسِ مِن رَّبِّكَ بِٱلۡحَقِّ﴾ [النحل: ١٠٢]

“বলুন! একে ‘রূহুল কুদুস’ তথা পবিত্র ফেরেশতা তোমার রবের পক্ষ থেকে সত্যসহ নাযিল করেছেন।” [সূরা আন-নাহল, আয়াত: ১০২]

৬- অতঃপর গ্রন্থ প্রণেতা এমন কিছু গুণের কথা উল্লেখ করেছেন, যা রাসূল তো দূরের কথা এ কাজ মুসলিমকেও শোভা পায় না। আর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন শ্রেষ্ঠ মানুষ। লেখক রাসূলের নাম ও গুণ সম্পর্কে বলেন, উহাইদ, আজীর ও জারছুমা।[৩৬]

গ্রন্থের শুরুতে লেখক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উলুহিয়্যাতের দরজায় পৌঁছে দিলেন।

যেমন, মুইয়ি, নাসির, শাফি ও মুনজি ইত্যাদি গুণ বৈশিষ্ট্য যা পূর্বে অতিবাহিত হয়েছে। আর এখানে এসে রাসূলকে নিকৃষ্ট জীবাণু ও ভাড়াটে পর্যায়ে নামিয়ে দিলেন- নাউযুবিল্লাহ। এ ধরনের হীন কথায় দেহ কেঁপে যায় ও মন শিউরে ওঠে। মানুষের কাছে তা বিদিত যে, সেটি (জরছুমা) হচ্ছে ক্ষতিকর মিল রোগের ন্যায় একটি জীবাণু, যা প্রতিষেধকের ব্যবস্থা নেওয়া হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ থেকে একেবারেই পবিত্র ও মুক্ত। তিনি তো উম্মতের কল্যাণ করেছেন। রিসালাতের দায়িত্ব আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তিনি তাঁর শিক্ষা দ্বারা মানুষকে যুলুম, শির্ক

ও বিভক্তি থেকে উদ্ধার করে ন্যায় নিষ্ঠা ও তাওহীদের প্রতি পরিচালিত করছেন। আর যদি জীবাণু দ্বারা তিনি মূল কারণও উদ্দেশ্য নিয়ে থাকেন, তবুও তা সঠিক নয়।

৭- অতঃপর এ অবান্তর কথা বলার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য এমন মিথ্যা সিফাত সাব্যস্ত করতে ফিরে এসেছেন যাতে রয়েছে এমন শির্ক, যা আমল বাতিল করে দেয়। তিনি তার কিতাবের ৯০ পৃষ্ঠায় বলেন,

اللهم صل على من تفتقت من نوره الأزهار، واخضرت من بقية ماء وضوءه الأشجار.

“হে আল্লাহ! ঐ নবীর প্রতি রহমত বর্ষণ করুন, যার নূরে ফুলসমূহ সুশোভিত হয়ে উঠেছে এবং তাঁর অযুর অবশিষ্ট পানি দ্বারা সবুজ শ্যামল হয়ে উঠেছে বৃক্ষরাজি।”

অথচ মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন বৃক্ষরাজি। আর তিনি তার ফুলসমূহ করেছেন সুশোভিত ও তাতে সবুজ রঙ দান করেছেন।

৮- অতঃপর গ্রন্থের ১০০ পৃষ্ঠায় বলেন, সকল কিছুর অস্তিত্বের মূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। যদি তিনি তদ্বারা উদ্দেশ্য করেন- সকল অস্তিত্ব সম্পন্ন বিষয়াদি আল্লাহ তা‘আলা

মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তাহলে তা মিথ্যা। কেননা মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَمَا خَلَقۡتُ ٱلۡجِنَّ وَٱلۡإِنسَ إِلَّا لِيَعۡبُدُونِ ٥٦﴾ [الذاريات: ٥٦]

“আমি জিন্ন এবং ইনসান জাতিকে কেবল আমার ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছি।” [সূরা আয-যারিয়াত, আয়াত: ৫৬]

৯- অতঃপর গ্রন্থের ১৮৯ পৃষ্ঠায় লেখক বলেন,

اللهم صل على محمد ما سجعت الحمائم، وحمت الحوائم، وسرحت البهائم، ونفعت التمائم.

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ-এর প্রতি কবুতর ঝাঁকের বাকুম বাকুম ডাকের, ঘুরঘুরকারী পাখীসমূহ ডিমের তা প্রদান, চতুষ্পদ জন্তুর বিচরণশীলতা ও তাবিজ-তুমারের উপকার পরিমাণ শান্তিধারা বর্ষণ করুন।”

এ ধরনের কথাগুলো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাণীর বিরোধী। যেখানে তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তাবিজ-ক্ববজ থেকে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন,

«من تعلق تميمة فقد أشرك»

“যে ব্যক্তি তাবিজ ঝুলালো, সে শির্ক করলো।”[৩৭]

আর তামিমাহ বা তাবিজ বলা হয় কু-দৃষ্টি প্রতিরোধের জন্য পশুর চামড়া বা কাগজের টুকরা ইত্যাদির ন্যায় যা কিছু সন্তানের শরীরে গাড়ি অথবা বাড়িতে লটকানো হয়। সেটি শির্কের অন্তর্গত। আর লেখকের কথা কুরআনের বিপরীত। কুরআন বলে : উপকার করা বা ক্ষতি সাধন করা আল্লাহর তরফ থেকে হয়। আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿وَإِن يَمۡسَسۡكَ ٱللَّهُ بِضُرّٖ فَلَا كَاشِفَ لَهُۥٓ إِلَّا هُوَۖ وَإِن يَمۡسَسۡكَ بِخَيۡرٖ فَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٞ ١٧﴾ [الأنعام: ١٧]

“আর যদি আল্লাহ তোমাকে কোনো কষ্ট দেন, তবে তিনি ব্যতীত তা

অপসারণকারী কেউ নেই। পক্ষান্তরে যদি তোমার মঙ্গল করেন, তবে তিনি সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।” [সূরা আল-আন‘আম, আয়াত: ১৭]

১০- ‘দালাইলুল খাইরাত’ গ্রন্থ প্রণেতা আল-জাযুলী আরও বলেন,

اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من الصلاة شيء، وارحم محمدا حتى لا يبقى من الرحمة شيء، وبارك على محمد حتى لا يبقى من البركة شيئ، وسلم على محمد حتى لا يبقى من السلام شيء.

“হে আল্লাহ! মুহাম্মাদের প্রতি এমনভাবে সালাত পেশ কর, যাতে সালাতের কিছু অবশিষ্ট না থাকে। মুহাম্মাদের প্রতি এমনভাবে রহমত

নাযিল কর, যাতে রহমতের কিছু অবশিষ্ট না থাকে। মুহাম্মাদের প্রতি এমন বরকত দাও, যাতে বরকতের কিছু বাকি না থাকে। আর মুহাম্মাদের প্রতি এমন সালাম/শান্তিধারা বর্ষণ কর, যাতে শান্তিধারার কিছুই বাকি না থাকে।”[৩৮]

এটা ভ্রান্ত কথা; যা কুরআনের খেলাফ। কেননা আল্লাহ তা‘আলা বলেন,

﴿قُلۡ لَّوۡ كَانَ ٱلۡبَحۡرُ مِدَادٗا لِّكَلِمَٰتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلۡبَحۡرُ قَبۡلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَٰتُ رَبِّي وَلَوۡ جِئۡنَا بِمِثۡلِهِۦ مَدَدٗا ١٠٩﴾ [الكهف: ١٠٩]

“বলুন! আমার রবের কথা লিখার জন্য যদি সমুদ্রের পানি কালি হয়, তবে

আমার রবের কথা শেষ হওয়ার আগে সে সমুদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে। যদিও আমরা এনে দেই অনুরূপ আরো একটি সমুদ্র।” [সূরা আল-কাহাফ, আয়াত: ১০৯]

১১- গ্রন্থের শেষে গ্রন্থকার সালাতুল মাশিশিয়া নামে এক প্রকার দুরূদ-এর কথা উল্লেখ করেন, যা ২৫৯-২৬০ পৃষ্ঠার টীকায় রয়েছে। এর উদ্ধৃতি এই :

اللهم صل على من منه إنشقت الأسرار، وانفلقت الانوار، وفيه ارتقت الحقائق.....ولا شيء إلا هو به منوط إذا لولا الواسطة لذهب كما قيل الموسوط.

“হে আল্লাহ! ঐ নবীর প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করুন, যার অনুগ্রহে গোপন রহস্যসমূহ বিদীর্ণ হয়েছে। আলোসমূহ

উদ্ভাসিত হয়েছে এবং সত্যসমূহ পূর্ণতা লাভ করেছে। তিনি (রাসূল) ব্যতীত কোনো কিছুরই অস্তিত্ব নেই। আর (আল্লাহ) তাঁর ওপর নির্ভরশীল। যদি তাঁর মাধ্যম না হতো, তাহলে যেমন বলা হয় যার (নিকট পৌঁছার) জন্য মাধ্যম স্থির করা হয়, সে বিলীন হয়ে যেতো।”

আমি বলি: প্রথমাংশের কথাটি বাতিল। আর শেষাংশটি জ্ঞানহীনের প্রলাপ। অতঃপর গ্রন্থের ২৬ পৃষ্ঠায় এই দো‘আর অবশিষ্টাংশে বলেন,

وزج بي في بحار الأحدية، وانشلني من أوحال التوحيد، وأغرقني في عين بحر الوحدة، حتي لا أرى ولا أسمع ولا أحس إلا بها.

“আমাকে একত্বের সাগরে ভাসিয়ে দাও। আমাকে তাওহীদের ময়লা-আবর্জনা থেকে উঠিয়ে নাও এবং আমাকে একত্বের সমুদ্র ঝরণায় ডুবিয়ে দাও! যেন আমি তা ব্যতীত আর কিছু না দেখি, না শুনি ও না অনুভব করি।”

লক্ষ্য করুন হে মুসলিম ভাই! এ দো‘আতে দু’টি বিষয় রয়েছে :

এক- তার কথা (আমাকে তাওহীদের ময়লা থেকে উঠিয়ে নাও!) তবে কি তাওহীদের ময়লা-আবর্জনা আছে? নিশ্চয় ইবাদত ও দো‘আয় আল্লাহর তাওহীদ পরিচ্ছিন্ন তাতে কোনো প্রকার ময়লা ও আবর্জনা নেই। যেমনটি ইবন মাশীশ ধারণা করে থাকে।

প্রকৃতপক্ষে নবী অথবা ওলীদের ন্যায় গাইরুল্লাহর নিকট দো‘আ চাওয়ার মাঝে কদর্য ও ময়লা রয়েছে। আর এটিই শির্কে আকবার তথা বড় শির্কের অন্তর্গত। যা আমল পণ্ড করে এবং সম্পাদনকারীকে চির জাহান্নামী করে দেয়।

দুই- তার কথা : (আমাকে নিয়ে একত্বের সাগরে ভাসিয়ে দাও। আর আমাকে একত্বের সমুদ্র ঝরণায় ডুবিয়ে দাও!)

এটি এক শ্রেণির সূফীদের অদ্বৈতবাদী বিশ্বাস। যা তাদের পুরোধা দামেস্কে সমাহিত ইবন আরাবী তার ‘আল-

ফুতুহাত আল-মাক্কিয়্যাহ’ গ্রন্থে ব্যক্ত করেছেন।

তিনি বলেন,

العبد رب والرب عبد يا ليت شعري من
المكلف؟

إن قلت عبد فذاك حق أو قلت رب فاني رب
يكلف؟

“বান্দাই রব, আর রবই বান্দা, আহা যদি জানতাম কে মুকাল্লাফ (শরী‘আতের নির্দেশ মানতে বাধ্য)? যদি বলি বান্দা, তাহলে তা-ই সত্য। অথবা যদি বলি রব, তবে কোথায় সে রব যে মুকাল্লাফ (আদেশ পালনের জন্য বলা) হবে?””

লক্ষ্য করুন! কীভাবে সে বান্দাকে রব আর রবকে বান্দা স্থির করল? ইবন আরাবী ও ইবন মাশীশ-এর (সূফীদ্বয়ের) নিকট রব ও বান্দা উভয়ই সমান। যা ‘দালাইলুল খাইরাত’ গ্রন্থে উল্লেখ হয়েছে।

১২- লেখক গ্রন্থের ৮৩ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন :

اللهم صل على كاشف الغمة ومجلي الظلمة ومولى النعمة ومؤتي الرحمة.

“হে আল্লাহ! আপনি (মুহাম্মাদ-এর) ওপর সালাত পেশ করুন, যিনি মেঘমালা বিদূরণকারী, আঁধারকে আলোকময়কারী, নি‘আমতের মালিক ও রহমতদাতা।”

আমি বলি: এটি প্রশংসার ক্ষেত্রে অতিমাত্রায় বাড়াবাড়ি, যা ইসলাম মেনে নেবে না।

১৩- আলী ইবন সুলতান মুহাম্মাদ আলক্বারী (সূফী) স্বীয় ‘আল-হিযবুল আজম’ নামীয় কাব্যগুচ্ছে (যা ‘দালাইলুল খাইরাত/১৫-এর টীকায় ছাপা আছে) বলেন,

اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره.

“হে আল্লাহ! আমাদের নেতা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি শান্তিধারা বর্ষণ করুন, যার নূর সৃষ্টির অগ্রবর্তী।”

আমি বলি: এটি বাতিল কথা। নিম্নোক্ত হাদীসটি একে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। হাদীসে বর্ণিত হচ্ছে :

«إن أول ما خلق الله القلم»

“নিশ্চয় আল্লাহ সর্বপ্রথম ক্বলব সৃষ্টি করেন।”[৩৯]

পক্ষান্তরে “সর্বপ্রথম আল্লাহ তোমার নবীর নূর সৃষ্টি করেছেন হে জাবের!” হাদীসখানা মুহাদ্দিসদের নিকট মিথ্যা, বানোয়াট ও বাতিল।

১৪- ‘দালাইলুল খাইরাত’ গ্রন্থের কোনো কোনো সংখ্যার শেষে ক্বাসীদা/কবিতায় এসেছে :

يا أبى خليل شيخنا وملاذنا قطب الزمان هو المسمى محمد

“হে বাবা! গুরুধন কুতুবে যমান

তিনি তো গুরু মুহাম্মাদ আমাদের আশ্রয়স্থান।”

কবি বলেন, নিশ্চয় সে তার সূফী শাইখ মুহাম্মাদের কাছে আশ্রয় চায় ও বিপদ-আপদে তাঁরই দিকে সে প্রত্যাবর্তন করে। আর তা সুস্পষ্ট শির্ক। কেননা মুসলিম আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করে না এবং বিপদে কারোর দিকে প্রত্যাবর্তন করে না। নিসন্দেহে আল্লাহ চিরঞ্জীব ও ক্ষমতাবান। পক্ষান্তরে তা (ঐ কবির) সূফী শাইখ মৃত অক্ষম;

কোনো উপকার সাধন ও ক্ষতি করতে পারেন না।

সে এও ধারণা করে যে, তার শাইখ ‘কুতুবুয যামান’। এটা সূফীদের বিশ্বাস। তারা বলেন, পৃথিবীতে কতক কুতুব আছেন, তারা পৃথিবীর বিষয়াদি আবর্তন-বিবর্তন ঘটান। এমনকি (এই সূফীরা) তাদের কুতুবদের পৃথিবী নিয়ন্ত্রণে আল্লাহর অংশীদার সাব্যস্ত করেছে। অথচ পূর্ব যুগের মুশরিকরা পর্যন্ত এই বিশ্বাস পোষণ করত যে, পৃথিবীর নিয়ন্ত্রক/পরিচালক একমাত্র আল্লাহ।

আল্লাহ বলেন,

﴿قُلۡ مَن يَرۡزُقُكُم مِّنَ ٱلسَّمَآءِ وَٱلۡأَرۡضِ أَمَّن يَمۡلِكُ
ٱلسَّمۡعَ وَٱلۡأَبۡصَٰرَ وَمَن يُخۡرِجُ ٱلۡحَيَّ مِنَ ٱلۡمَيِّتِ
وَيُخۡرِجُ ٱلۡمَيِّتَ مِنَ ٱلۡحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ ٱلۡأَمۡرَۚ
فَسَيَقُولُونَ ٱللَّهُ﴾ [يونس: ٣١]

“বলুন! আসমান ও যমীন থেকে কে তোমাদেরকে রুযী দান করে অথবা কে তোমাদের কান ও চোখের মালিক? তাছাড়া কে জীবিতকে মৃতের ভিতর থেকে এবং মৃতকে জীবিতের মধ্য থেকে বের করেন। আর কে কর্ম সম্পাদনের ব্যবস্থা করেন? তখন তারা বলে উঠবে : আল্লাহ।” [সূরা ইউনুস, আয়াত: ৩১]

১৫- ‘দালাইলুল খাইরাত’ গ্রন্থে সহীহ দো‘আও বর্ণিত আছে। তবে তাতে বিদ্যমান পূর্বোল্লিখিত বড় বড়

ধ্বংসাত্মক (আকীদা-বিশ্বাস) পাঠকরে আকীদায় বিপর্যয় ঘটিয়ে দেবে। যদি সে তা বিশ্বাস করে। কাজেই সঠিক দো‘আসমূহ তার উপকারে আসতে পারে এমনটি ভাবা যায় না। আর কিতাবে তো অনেক অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। কেউ যদি বিস্তারিত জানতে চান তাহলে উস্তাদ মুহাম্মাদ মাহদী ইস্তাম্বুলী প্রণীত ‘কুতুবুন লাইসাত মিনাল ইসলাম’ গ্রন্থখানা পাঠ করে দেখতে পারেন। সে গ্রন্থটিতে তিনি ‘দালাইলুল খাইরাত’ ক্বাসীদায়ে বুরদাহ, মাওলিদুল আরূস, ত্বাবাকাতুল আউলিয়া লিশ শা‘রাণী ও তাইয়্যাতু ইবনিল ফারিদ্ব, আনওয়ারুল কুদসিয়্যাহ, আত-তানভির ইসকাতিত তাদবীর, মি‘রাজ ইবন আব্বাস

ও আল-হিকামু লি ইবন আতাউল্লাহ আল-ইস্কান্দরী ইত্যাদি গ্রন্থসমূহ যা আগুনে পুড়িয়ে ফেলতে লেখক চেয়েছেন। কেননা তাতে মুসলিমদের আকীদায় ক্ষতিকর প্রভাবকারী এমন সব বিষয় আছে।

১৬- হে মুসলিম ভাই! এসব কিতাব পাঠ থেকে বিরত হোন। আপনি শাইখ ইসমাঈল আল-ক্বাজী প্রণীত ও মুহাদ্দিস আলবানী কর্তৃক তাহকীককৃত, ফযলুস সালাত আলান নাবী (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কিতাবখানা পাঠ করুন। অনুরূপভাবে খাইরুদ্দীন ওয়ায়িলী প্রণীত ‘দলীলুল খাইরাত’ নামক একটি

নতুন কিতাব রয়েছে। সেখানে লিখক বিশুদ্ধ দুরূদ ও দো‘আসমূহ সংকলন করেছেন। ‘দালাইলুল খাইরাত’ যা আপনাকে শির্ক ও গুনাহে পতিত করবে- তা থেকে আপনার জন্য এটিই যথেষ্ট হবে।

اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه وحببنا فيه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وكرهنا فيه وصلى الله على محمد وعلى آله وسلم.

সমাপ্ত

সূফীবাদ: এ গ্রন্থে সূফীবাদের হাকীকত, তাদের কতিপয় বাণী, ওলী কাকে বলে, কাসীদায়ে বুরদা কী, দালাইলুল খাইরাত গ্রন্থের পরিচয় ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

---

[১] الصوف ‘আস-সৌফ’ থেকে সূফী শব্দটির উৎপত্তি। আর ‘সৌফ’ বলা হয় পশমী কাপড়কে। হিন্দুদের যোগী-সন্যাসীদের ন্যায় মুসলিমদের এক শ্রেণির সৌফ বা পশমী কাপড় পরে নিজেদের সাধু হিসেবে পরিচয় দিতে লাগে। তখন থেকেই ইসলাম বিকৃতকারী এই ধরণের সন্যাসীদের সূফী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। বর্তমানে তা একটি নির্দিষ্ট ধর্মীয় আকীদায় পরিণত হয়েছে। -অনুবাদক।

[২] তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি হাদীসটিকে হাসান সহীহ বলেছেন।

[৩] আয়াতে উল্লিখিত, (الظالمين) দ্বারা (المشركين) বা মুশরিক জনতা উদ্দেশ্য। অর্থাৎ তুমি যদি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কাউকে ডাকো, তাহলে তখন তুমিও মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে।

[৪] আল-ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ লি ইবন আরাবী।

[৫] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৮।

[৬] অর্থাৎ নবীগণ জান্নাতের আশায় ও জাহান্নামের ভয়ে আল্লাহকে ডাকতেন। আল্লাহ তাদের ডাক পছন্দ করেন ও তাদের প্রশংসা করেন। অথচ সূফীরা তার উল্টা বিশ্বাস করে থাকে।

[৭] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৭০৪।

[৮] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৭১৮।

[৯] (সহীহ) আহমদ ও নাসাঈ।

[১০] তাবরানী, হাদীসটি হাসান।

[১১] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৪২।

[১২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১১৮৮; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৯৭।

[১৩] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৭২৫৭ ও মুসলিম ১৮৪০।

[১৪] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৩৮২।

[১৫] সুদানের আদালত তাকে হত্যার আদেশ দেয়। অতঃপর তাকে হত্যা করা হয়।

[১৬] চিন্তা করে দেখুন, এ হচ্ছে সুফীদের তথাকথিত কারামত। যা তাদের লোক দ্বারাই বর্ণিত। কোনো সাধারণ মুসলিম যে কাজ করলে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায় তা তাদের তথাকথিত ওলী দ্বারা সংঘটিত করে কারামাত বানানো হলো। আমরা বলব, এসব ওলী নিঃসন্দেহে শয়তানের দোসর। তারা কখনো আল্লাহর ওলী হতে পারেন না। সেসব তথাকথিত ওলী যা যা অস্বাভাবিক কাজ করত তা কেবল শয়তানের সহযোগিতায় করতে সমর্থ হতো। [সম্পাদক]

[১৭] নাউযুবিল্লাহ, তারা অমুসলিম কাফেরদেরকে আল্লাহর সত্তা বানিয়েছে!

[১৮] উক্ত কিতাব ৪/৪৫৬ পৃঃ দ্রঃ।

[১৯] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৩৩০; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৫২৯।

[২০] তবুও একটি প্রাচীর দ্বারা কবরকে মসজিদ থেকে আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখা আছে। যাতে কেউ কবরকে মসজিদ হিসেবে গণ্য না করে। -অনুবাদক। যদিও তখনকার জীবিত আলেমগণ সেটার বিরোধিতা করেছিলেন। যেমন, প্রখ্যাত তাবেঈ

সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যেবসহ আরও অনেকে। [সম্পাদক]

[২১] সহীহ মুসলিম।

[২২] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৬৫০২।

[২৩] তিরমিযী (হাসান সহীহ)।

[২৪] নাউযুবিল্লাহ। কিভাবে তার কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী কথা বলে সেটাকে তাওহীদ বলছে, আর কুরআন ও সুন্নায় যা এসেছে সেটাকে শির্ক বলছে। [সম্পাদক]

[২৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৪৯৭।

[২৬] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫।

[২৭] তিরমিযী, হাদীস নং ২৪১৬ (হাসান সহীহ)।

[২৮] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৪৭৭১।

[২৯] আহমদ (সহীহ হাদীস)।

[৩০] নাসাঈ (সনদ হাসান)।

[৩১] তিরমিযী, হাদীস নং ২৫১৬ (হাসান সহীহ)।

[৩২] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫৪।

[৩৩] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৫৪।

[৩৪] নাসাঈ (সনদ হাসান)।

[৩৫] সহীহ বুখারী, হাদীস নং ৩৪৪৫।

[৩৬] দালাইলুল খাইরাত/৭৭-১১৫।

[৩৭] আহমদ, সহীহ।

[৩৮] ঐ ৬৮ পৃষ্ঠা।

[৩৯] আহমদ, (আলবানী সহীহ বলেছেন)।